স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৭ম বর্ষ ❑ ষষ্ঠ সংখ্যা ❑ আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার,
ডা. কুশল সেন,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

পেপটিক আলসার

আমরা হরবখত 'গ্যাস্ট্রিক' আলসার বলি বটে, কিন্তু আসলে কথাটা হবে 'পেপটিক' আলসার। পেপটিক আলসার দু-ধরনের। পাকস্থলীর মধ্যকার ক্ষত বা আলসার-এর নাম গ্যাস্ট্রিক আলসার, দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের ক্ষত হল ডিয়োডিনাল আলসার। একে ঠেকানো যায়, আর আগের তুলনায় এর চিকিৎসাও অনেক ভালো। কিন্তু সময়ে চিকিৎসা না করলে তা মারাত্মক হতে পারে। লিখেছেন **ডা. দীপংকর জানা**। ৭

শ্রোণির সামনে ঝুঁকে পড়া

পিঠে ব্যথা নিয়ে আমাদের প্রায় সবাই কমবেশি ভুগি। কিন্তু আমাদের কিছু বদভ্যাস বদলালে তা আটকানো যায়। যেমন পুরোনো বদভ্যাস হল হাই হিল জুতো পড়া, আর নতুন বদভ্যাস হচ্ছে সেলফি তুলতে দেহটা বিশেষভাবে বাঁকানো। এতে আমাদের মেরুদণ্ডের একেবারে নীচের অংশটা বেঁকে যায়, শ্রোণিদেশ সামনে হেলে যায়। তার ফলে পিঠে ব্যথা ও অন্যান্য সমস্যা হয়। লিখেছেন **ডা. অনিন্দিতা**। ২৪

ডাক্তারিতে প্রযুক্তি ও চিকিৎসকের নিরাময়-স্পর্শ

স্যার কোনান ডয়েল ডাক্তারের রোগ ধরার আদলে শার্লক হোমসের গোয়েন্দাগিরি সাজিয়েছিলেন—চোখের সামনে পড়ে থাকা সূত্রগুলো গেঁথে সমাধানে পৌঁছোনোর ছক। গোয়েন্দার মানবিক হবার দায় নেই, তিনি প্রযুক্তির এই যুগে কমপিউটার হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু চিকিৎসকদের মানবিকতা আর রোগনির্ণয় 'শিল্প'-টি যান্ত্রিক হলে তার সারিয়ে-তোলা-স্পর্শটিই যায় হারিয়ে—লিখেছেন **ডা. অপূর্ব**। ৩৭

স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যাটি ঠিক কোথায়?

বর্তমানে চিকিৎসা বিক্রয়যোগ্য পরিষেবা, রোগী উপভোক্তা-ক্রেতা মাত্র। অসুস্থ মানুষ চায় মানবিক মুখ, মানুষের স্পর্শ। এসেছে নতুন এক পাঠ্যবিষয়ের—মেডিক্যাল হিউম্যানিটিজ। লক্ষ্য বিবেকবান চিকিৎসক তৈরি করা, যিনি রোগীর কষ্ট অনুভব করবেন, কিন্তু অসুখের সামাজিক কারণ, অপুষ্টি-ক্ষুধার কথা ভাববেন না। আসলে দরকার সামাজিক অসাম্য বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়া, দরকার দেশের প্রয়োজন মেনে একটি স্বাস্থ্যমডেল, সবার জন্যে স্বাস্থ্যের সমানাধিকার। লিখেছেন ডা. বিষাণ বসু ৫২

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস কী?	ডা. নিবেদিতা	৪
পেপটিক আলসার	ডা. দীপংকর জানা	৭
শিরার মধ্যে রক্ত জমে যাওয়া (ডিভিটি)	ডা. কুশল সেন	১১
আক্কেল দাঁত কখন তুলতে হয়	ডা. পুণ্যব্রত গুণ	১৭
সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ	ডা. সুমিত দাশ	১৯
প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক কর্মজীবন সম্ভব	রুমঝুম ভট্টাচার্য্য	২১
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন	২৩
শ্রোণির সামনে ঝুঁকে পড়া	ডা. অনিন্দিতা দাস	২৪
ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	২৬
অমৃতস্যপুত্রাঃ	ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত	৩১
সাদা তোয়ালে	ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক	৩৫
ডাক্তারি প্রযুক্তি ও চিকিৎসা নিরাময়-স্পর্শ	ডা. অপূর্ব	৩৭
ওষুধের দুনিয়া: বাজার যখন রাজা	মিল্টন প্যাকার	৪০
দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা	ধ্রুবজ্যোতি দে	৪২
হোমিয়োপ্যাথি: একটি আলোচনা	ডা. অর্ক বৈরাগ্য	৪৬
মোদীকেয়ার: পুরোনো মদ নতুন নেশা	ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়	৪৯
স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যাটি ঠিক কোথায়?	ডা. বিষাণ বসু	৫২
হোস্টেলে সুস্থ জীবনের দাবি: জয়ী মেডিক্যাল		৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।
Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন
অথবা
NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315
সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

সাধারণ সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের কাজের চাপ বরাবরই অকল্পনীয়। ফাঁকিবাজেরা সব জায়গাতে আছেন, কিন্তু সৎ ডাক্তার নেহাত কম নেই। পাঁচঘণ্টায় আউটডোরে একা পাঁচ-ছশো রোগীর রোগ ধরে চিকিৎসা তাঁরাই করেন। এঁদের ক্লিনিক্যাল দক্ষতা ঈর্ষণীয়, উপার্জন বলার মতো নয়, প্রাইভেট প্র্যাকটিস কেউ করেন, কেউ করেন না। কিন্তু এতদিন এঁরা এতেই তৃপ্ত থাকতেন। এখন রোজ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আর কর্পোরেট-উচ্ছিষ্ট-মানসিকতা-সমৃদ্ধ আমলাদের ফরমানে তাঁরা বীতশ্রদ্ধ। সেইসঙ্গে হেনস্থার ভয়। সরকারি ডাক্তাররা চাকরি বাঁচাচ্ছেন, কেউ কেউ ছাড়ছেন, আর নতুন ডাক্তাররা সরকারি চাকরি করছেন না, বন্ডের দু-তিনবছর দায় ঠেলে পিঠ বাঁচাচ্ছেন। বেসরকারি কর্পোরেটে যুক্ত থাকা ডাক্তারবাবুদের সমস্যা আলাদা— মার্কেটিং টিমের ক্রমাগত চাপ তাঁদের নিত্যসঙ্গী, অনেকে আপোশ করেন, আত্মগ্লানিতে ভোগেন। এছাড়া রয়েছে গুণ্ডা-মামলা-হয়রানির ভয়, রাজনৈতিক দাদাগিরি।

কিন্তু ডাক্তারদের এই হেনস্থায় সাধারণ মানুষ খুব বিচলিত নন। তাঁদের চিকিৎসক ছাড়া চলে না। তাহলে? অনেকে এটাকে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবেই দেখছেন। তা কিন্তু নয়। প্রয়োজনের তুলনায় নড়বড়ে পরিকাঠামো, নামমাত্র সরকারি বরাদ্দ, একদল চিকিৎসকের দুর্নীতি, কর্পোরেটের লালসা, আর সরকারি অপদার্থতা ঢাকতে জনবিক্ষোভের অভিমুখ ডাক্তারের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া— হ্যাঁ, এগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ দিয়েও চিকিৎসকদের প্রতি বেশির ভাগ মানুষের ভরসার অভাব বা বিদ্বেষের ব্যাখ্যা হয় না।

ধনী-গরিব ভেদ, পরিবেশ-দূষণ, এসবের ফলে সাধারণ মানুষের ওপর রোগের বোঝা, তার ওপর চিকিৎসার বিরাট খরচ, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা কমিয়ে দেওয়া, এর জন্য মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়ে সামনে থাকা ডাক্তারের ওপর। কিন্তু এখনও সামাজিক ও আর্থিক অসাম্য আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তার প্রভাব, স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোর অসম বিন্যাস ও সেজন্য রোগীদের ক্ষোভ, স্বাস্থ্য-রাজনীতির এইসব প্রাথমিক কথা নিয়েও বেশির ভাগ চিকিৎসক তেমন ভাবেন না। সবার জন্যে স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিটি অধিকাংশ চিকিৎসক সংগঠনের অ্যাজেন্ডায় বিষয়টি স্থান পেয়েছে, তবু সংখ্যাগরিষ্ঠ ডাক্তার তা নিয়ে নীরব।

রাজনীতি কথাটা এখন প্রায় নোংরামোর সমার্থক শব্দ। তাই ডাক্তাররা স্বাস্থ্য-রাজনীতি নিয়ে ভাবতে অভ্যস্ত নন। অনেকেই বলেন তাঁদের কাজ চিকিৎসা করা, অত ভাবলে চিকিৎসা হয় না। কিন্তু ডাক্তার চিকিৎসা করেন ব্যক্তির, আর রাজনীতিক চিকিৎসা করেন সমাজব্যবস্থার। চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ হবে তখনই যেদিন তা সমাজ ও রাজনীতির সঙ্গে সদর্থকভাবে যুক্ত হবে। রাজনীতি এক বৃহৎ সামাজিক চিকিৎসাই, কেননা খালি পেট ভর্তি করাটা হল স্বাস্থ্যের প্রথম শর্ত, আর সেটা করতে রাজনীতি না করে উপায় নেই।

বর্তমানে চিকিৎসা বিক্রয় হয়, রোগী ক্রেতা মাত্র। এতে স্বাস্থ্যব্যবসায়ীর লাভ। কিন্তু রোগী চায় মানবিক মুখ, মানুষের স্পর্শ। তাই চিকিৎসককে 'মানবিক' তৈরি করতে এল এক পাঠ্যবিষয়— মেডিক্যাল হিউম্যানিটিজ। শেষ পর্যন্ত যার উদ্দেশ্য হল কর্পোরেট লালসার ফ্রন্টডেস্কে থাকুন আন্তরিক চিকিৎসক। মানুষ ভাববে, বদলেছে ব্যবস্থা। কিন্তু এ হল বানিয়ার মিষ্টিমুখ। আন্তরিক চিকিৎসকটি রোগীর কষ্ট অনুভব করবেন, কিন্তু রোগের পেছনে সমাজ ও রাজনীতির খেলা দেখতে পেয়েও মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন। অপুষ্টি-ক্ষুধার, অসুখের সামাজিক কারণ তাঁকে বিব্রত করবে না, কিন্তু ব্যক্তিরোগীর হৃদয় স্পর্শ করার সৎ চেষ্টাতে যাঁর খামতি থাকবে না।

একদিকে মুনাফার লোভে বেপরোয়া কর্পোরেট, অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের সেবা করার জন্য উদারহৃদয় ডাক্তার, এই বিপরীতধর্মী দু-টি উপাদান কর্পোরেটকে কতটা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতে পারবে তা বলা শক্ত। কিন্তু শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যদি কেবল এই খাতেই বয় তবে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য একটি দয়ার দান হয়েই থাকবে। আর কেরিয়ারিস্ট সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ আর তাদের পেছনে থাকা বিশাল পুঁজির বিপরীতে, 'মানবিক' ডাক্তাররাও শেষ পর্যন্ত একটি জনবিচ্ছিন্ন একক মানুষ, এক আধুনিক ট্র্যাজেডির নায়ক হয়েই থাকবেন।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস কী?

ডা. নিবেদিতা

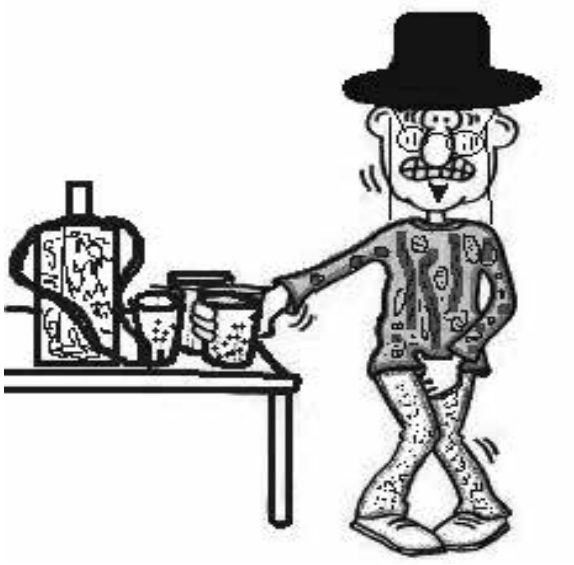

ডায়াবেটিস বলতে আমরা সাধারণত ডায়াবেটিস মেলিটাস বুঝি, যা কিনা শরীরে ইনস্যুলিন নামক হরমোনের অভাবে হয়ে থাকে। কিন্তু আরেক ধরনের ডায়াবেটিস আছে, তার কথা আমরা একেবারেই জানি না। এর নাম ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস।

'ইনসিপিডাস' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'ইনসিপিড' থেকে যার অর্থ 'স্বাদহীন'। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগে শরীরের জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সাধারণত একটি হরমোনের অভাবে এটি হয়, সেই হরমোনের নাম অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হরমোন (ADH) বা ভ্যাসোপ্রেসিন।

দু-ধরনের ডায়াবেটিস রোগেই রোগী প্রচুর পরিমাণে মূত্রত্যাগ করেন। ডায়াবেটিস মেলিটাস বা সাধারণ ডায়াবেটিসে মূত্রে শর্করা থাকে, আর তাই শর্করার সঙ্গে সঙ্গে বেশি জল বেরিয়ে যায়। আর ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগে বৃক্ক বা কিডনির জল ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়, ফলে স্রেফ জলই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়, মূত্র হয় পাতলা।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগীর সংখ্যা ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগীর তুলনায় অনেক কম। প্রায় প্রতি ২৫০০০ মানুষে মাত্র একজন এই রোগের শিকার হন। দুই রোগের উৎপত্তির কারণ আলাদা কিন্তু কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন বহুমূত্র (ইংরাজিতে বলে 'পলিইউরিয়া') এবং ঘন ঘন তেষ্টা পাওয়া ('পলিডিপসিয়া')। অনেক সময় রোগীরা, এমনকী ডাক্তাররাও, বহুমূত্র আর বেশি তেষ্টা শুনলে ধরেই নেন ডায়াবেটিস মেলিটাস হয়েছে—এদের অল্প কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসও হতে পারে।

শরীরে তরলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ

আমাদের শরীরের ওজনের গড়ে ৫০-৭০ ভাগই জল। আমরা প্রতিদিন ১-২ লিটার জল পান করি, গরমকালে ঘাম বাড়ে ও জলপানও বাড়ে। প্রায় ১.২ লিটার জল বিভিন্ন শারীরিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। শরীর থেকে মূলত তিনটি প্রক্রিয়ায় জল বেরিয়ে যায়—

ক. মলত্যাগ, খ. ত্বক থেকে এবং নিশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে, গ. মূত্রের মাধ্যমে।

কোনো কারণে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গেলে দেহের রক্তরসের (ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ তরলের) ঘনত্ব বেড়ে যায়। এর ফলে শরীরে বেশি জল ধরে রাখার দরকার হয় ও শরীর জল সংরক্ষণের চেষ্টা করে।

দেহের রক্তরসের ঘনত্ব বেড়ে গেলে মস্তিষ্কে অবস্থিত পশ্চাদ্-পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হরমোনের (ADH) ক্ষরণ বেড়ে যায়। এই হরমোন রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে বৃক্কে (কিডনিতে) আসে। বৃক্ক থেকে যে জল বেরিয়ে যেত, এই হরমোনের প্রভাবে তার একটা অংশ দেহে থেকে যায়, ফলে মূত্র ঘন হয়, ও কম জল শরীর থেকে বেরোতে পারে। এরপর যখন জল পান করার ফলে শরীরে জলের অভাব কমে ও রক্তরসের ঘনত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তখন এই হরমোন ক্ষরণ কমে যায়। তারপর কম ঘনত্বের মূত্র উৎপাদিত হয়।

রোগের কারণসমূহ

কোনো কারণে অ্যান্টি-ডাইইউরেটিক হরমোনের (ADH) অভাব হলে বৃক্ক থেকে জল শোষিত হয় না। ফলে কম ঘনত্বের বর্ণহীন মূত্র প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়।

১. ক্রেনিয়াল ডায়ানেটিস ইনসিপিডাস: এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে কোনো রোগ সংক্রমণ, টিউমার, সার্জারি বা কোনো দুর্ঘটনায় আঘাতজনিত কারণে পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ADH হরমোন কম ক্ষরিত হয় ও ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হয়।

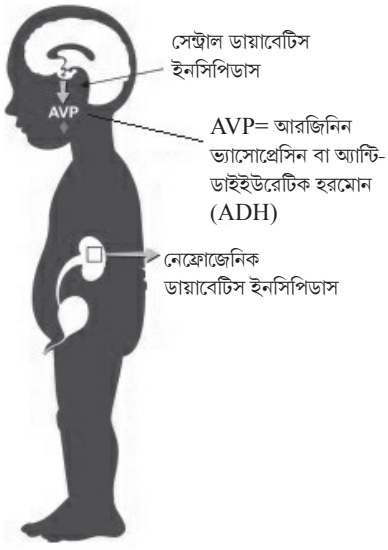

২. নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস: এক্ষেত্রে বৃক্কে ADH হরমোন কাজ করতে পারে না। জিনগত কারণে এই অসুখ হতে পারে। এছাড়া গ্লাইকোসুরিয়া (মূত্রে গ্লুকোজ নির্গত হওয়া), লিথিয়াম (মানসিক রোগে ব্যবহৃত ওষুধ)-এর ক্ষতিকর প্রভাবে নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস হয়।

এই দুটি প্রধান কারণ ছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে—

৩. গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস: কিছু কিছু বিরল ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় ADH হরমোনের অভাবে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হতে পারে। সাধারণত গর্ভাবস্থার ২০-৪০ সপ্তাহে এটা দেখা যায় এবং প্রসবের ৪-৬ সপ্তাহের মধ্যে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

৪. ডিপসোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস: এক্ষেত্রে রোগীর ঘন ঘন তেষ্টা পায় এবং রোগী বার বার মূত্র ত্যাগ করে। আগের কারণের সাথে এর পার্থক্য হল এক্ষেত্রে শরীরে ADH হরমোনের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে এবং প্রস্রাবের ঘনত্বও স্বাভাবিক সীমায় থাকে।

রোগের লক্ষণ

যেকোনো বয়সেই ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস হতে পারে। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে এর প্রাদুর্ভাব সমান।

প্রধান দুটি লক্ষণ

১. বর্ণহীন জলের মতো ঘন ঘন মূত্রত্যাগ। এমনকী তা ১৫-২০ মিনিট অন্তরও হতে পারে। সারাদিনে মূত্র ত্যাগের পরিমাণ ৩ লিটার থেকে ২০ লিটার (রোগের শেষ পর্যায়ে) হতে পারে।

২. সবসময় জল তেষ্টা পাওয়া এবং প্রচুর জলপানের পরও তৃষ্ণার্ত বোধ হওয়া।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ

কিছু জিনগত কারণে বাচ্চাদের এমনকী ১ সপ্তাহ বয়সেরও আগে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সদ্যোজাত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলি হল বমি হওয়া, তীব্রভাবে স্তন্যপান, জ্বর, মলত্যাগ না হওয়া, ডায়পার অতিরিক্ত ভিজে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া।

বড়ো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস রোগের লক্ষণগুলি—

১. রাত্রিতে বিছানায় মূত্রত্যাগ—যদিও তা ৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক।

২. ক্ষুধাভাব।

৩. সবসময় ক্লান্তি ভাব।

৪. অতিরিক্ত কান্না।

উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে কী জটিলতা হতে পারে?

১. যদি রোগী যথাসময়ে চিকিৎসা না পায়, তবে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ডিহাইড্রেশন হতে পারে। ফলে ক. মাথা ব্যথা, খ. মুখ এবং ঠোঁট শুকিয়ে যাওয়া, গ. খিটখিটে ভাব, ঘ. মাথা ঝিম ঝিম করা—ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

২. আয়নের ভারসাম্যহীনতা: শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার সোডিয়াম, ক্লোরিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি

যদি রোগী যথাসময়ে চিকিৎসা না পায়, তবে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ডিহাইড্রেশন হতে পারে।

আয়নের পরিমাণ আপেক্ষিকভাবে বেড়ে যায়। এর ফলে অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়াগুলো বিঘ্নিত হয়। ক্লান্তিভাব, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলির মিল আছে। আর ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস-এর তুলনায় ডায়াবেটিস মেলিটাসের প্রাদুর্ভাব বহুগুণ বেশি। তাই ডায়াবেটিস সন্দেহ হলে রোগীর রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস-এর ক্ষেত্রে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক সীমায় থাকে।

চিকিৎসকেরা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস সন্দেহ করে থাকলে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করতে বলেন—

১. ২৪ ঘণ্টায় মূত্র ত্যাগের পরিমাণ।

২. রক্তে বিভিন্ন আয়ন এবং শর্করার পরিমাণ।

৩. মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব।

৪. রক্তরসে (সিরামে) ADH হরমোনের পরিমাণ।

এছাড়া কোন প্রকারের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস তা নির্ণয় করার জন্য কিছু পরীক্ষা করতে বলেন, যেমন ওয়াটার ডিপ্রাইভেশন টেস্ট, ভ্যাসোপ্রেসিন টেস্ট, ও এমআরআই। এগুলো নিয়ে বিশদে বলার দরকার এখানে নেই।

রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা

বাচ্চাদের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের ক্ষেত্রে বাচ্চার মা বা বাচ্চার দেখভাল যাঁরা করছেন, তাঁদের বাচ্চাকে যথাযথ পরিমাণে জল

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে রোগীর চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল শরীরে মূত্র উৎপাদন কম করা।

খাওয়ানো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বিশেষত অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যায় যেখনে মলের মাধ্যমে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায়, বারবার বমি এইসব ক্ষেত্রে আয়নের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেখানে ।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসে রোগীর চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল শরীরে মূত্র উৎপাদন কম করা।

১. সেন্ট্রাল ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস

এক্ষেত্রে ক্ষতি সামান্য হলে রোগী সারা দিনে ৩-৪ লিটার মূত্র ত্যাগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে রোগীকে অন্তত ২.৫ লিটার করে জল খেতে বলা হয়। এছাড়া ডেসমোপ্রেসিন (Desmopressin) নামে ওষুধ দেওয়া হয় যা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত এবং ভ্যাসোপ্রেসিন (অর্থাৎ ADH)-এর মতোই কাজ করে। ডেসমোপ্রেসিন বড়ি বা নাকে নেবার স্প্রে, এই দু-ভাবে দেওয়া যায়।

২. নেফ্রোজেনিক ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস

লিথিয়াম বন্ধ করলে অনেক ক্ষেত্রে কিডনি আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করে তবে, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

এক্ষেত্রে রোগীকে কম নুন এবং কম প্রোটিনযুক্ত খাবার খেতে উপদেশ দেওয়া হয়। চিকিৎসকেরা অনেক ক্ষেত্রে থায়াজাইড (Thiazide) জাতীয় ওষুধের সঙ্গে আইবুপ্রোফেন জাতীয় বড়ি (এমনিতে ব্যথানাশক হিসেবে চালু) ব্যবহার করে থাকেন।

বাচ্চাদের ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের ক্ষেত্রে বাচ্চার মা বা বাচ্চার দেখভাল যাঁরা করছেন, তাঁদের বাচ্চাকে যথাযথ পরিমাণে জল খাওয়ানো সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

অসুখ যদি প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। পর্যাপ্ত যত্নের অভাবে বাচ্চা এবং বেশি বয়সিরা ডিহাইড্রেশান, জ্বর, রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া, এই সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. নিবেদিতা, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

একক মাত্রা

Advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা: ১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ: ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ: ৯৮৩০২৩৬০৭৬/৯৮৩০৪৯৩২৩৯

পেপটিক আলসার

ডা. দীপংকর জানা

সন্ধ্যে ৯ টা থেকে ডিউটি শুরু, খানিকটা দেরি হয়ে যাওয়ার জন্য একটু ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই ইমার্জেন্সিতে ঢুকলাম, দেখতে পেলাম বিরক্তিভরা মুখ নিয়ে আমার কো-হাউসস্টাফ আমারই অপেক্ষায় রোগী দেখে যাছে। বুঝলাম মর্নিং, ইভিনিংটায় ভালোই দৌড়োদৌড়ি করতে হয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখে খানিকটা হাসি ফিরে এসেছে দেখে আমিও খানিকটা স্বস্তি ফিরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন গেল আজ? "আর বলিস না! পেটব্যথা দেখতে দেখতে আমারই প্রায় পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গেছিল।" মৃদু স্বরে "ও আচ্ছা. . . তাই!" এই বলে হ্যান্ডওভার চার্ট শেষ করে গলায় স্টেথোস্কোপ আর পেনটা নিয়ে প্রেসক্রিপশন স্লিপের উপর তারিখ লিখতে লিখতে দেখতে পেলাম মধ্যবয়সি এক মহিলা কোঁচকানো মুখ নিয়ে খানিকটা মৃদু গতিতে হাঁটতে হাঁটতে আমার কাছে এসে পৌঁছোলেন।

"আর পারছি না।" "কী হয়েছে?" "এই দুই-তিন দিন ধরে অল্প অল্প করে পেটে ব্যথা করছিল, কয়েকটা গ্যাসের ওষুধ খেয়েছি, আজ আর পারছি না থাকতে।" "কোথায় ব্যথা করছে?" জিজ্ঞাসা করাতে "পেটের উপর দিকে" বললেন। আরও কয়েকটা প্রশ্ন করাতে পেটের ব্যথার সূচনা আর উপসংহার খোঁজার চেষ্টা করলাম। নিয়মিত কিছু ওষুধ খান কিনা জিজ্ঞাসা করাতে উত্তরে যখন বলে উঠলেন "স্যার আমার আর্থ্রাইটিসের সমস্যা আছে, তাই কয়েকদিন ধরে ব্যথার ওষুধ খাচ্ছিলাম।" এরপর একজন ফিমেল অ্যাটেন্ডেন্টকে ডেকে পেটের উপরের দিকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম, খানিকটা আর্তনাদ শুনে হাতটার গতি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম এইবার বোধ হয় সূচনা আর উপসংহারের মিলটা খুঁজে পেয়েছি। এরপর চটজলদি কয়েকটা ইঞ্জেকশন আর ইসিজি করার ঘণ্টা-খানেক পর দ্বিতীয়বার যখন রোগীকে জিজ্ঞাসা করলাম "কেমন আছেন?" "স্যার ব্যথাটা আগের চেয়ে কমেছে, কিন্তু এখনও খানিকটা রয়েছে।" তারপর নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার এটা কী জন্য হচ্ছিল?" আমি বেশ খানিকটা আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলে উঠলাম, "সম্ভবত এটা আপনার পেপটিক আলসার-এর জন্য হচ্ছিল।" তারপর আরও কিছু কথা বলে রোগীর মনের উদ্‌বেগ কমানোর চেষ্টা করলাম।

ও . . . আচ্ছা . . . কী বললাম রোগীর মনের উদ্‌বেগ কমাতে! তাই জানতে চাইছেন তো? বলছি, পুরোটাই বলছি, দেখুন হয়তো আপনাদের মধ্যেকার উদ্‌বেগ খানিকটা হলেও কমতে পারে।

আলসার কী?

আমাদের শরীরে দীর্ঘদিন ধরে কোনো এক জায়গায় ক্ষত তৈরি হওয়ার জন্য যে দশা তৈরি হয় তাকে আমরা আলসার বলি। দু-ধরনের আলসারকে আমরা পেপটিক আলসার বলি। প্রথমটি পাকস্থলীর মধ্যকার আলসার, যাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে আর দ্বিতীয়টি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশের আলসার, যাকে ডিয়োডিনাল আলসার বলে।

আলসার কীভাবে হয়?

প্রথমে বুঝতে হবে আমরা যে খাবার খাই সেই খাদ্যের মধ্যে আমাদের সারাদিনের কার্যকরার ক্ষমতা, বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিভিন্ন পর্যায়ে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা এরকমটা নয় যে আমরা খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি নির্দিষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে। এটা একটা প্রক্রিয়া যাতে খাদ্যগুলি জটিল অবস্থা থেকে সরল অবস্থায় পৌঁছোয় এবং এই সরল উপাদানগুলি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় শোষণ হয়ে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের পরিপাকতন্ত্রের মধ্যে ঘটতে থাকে এবং সবশেষে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলি মল রূপে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। জটিল অবস্থা থেকে সরল অবস্থায় আসার জন্য পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ যেমন পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি অংশ থেকে বিভিন্ন অ্যাসিড ও উৎসেচক বের হয়। এর মধ্যে যে অ্যাসিড বের হয় সেটি হল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCL) যা প্রধানত পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ থেকে বের হয়। এই অ্যাসিড খাদ্যের পাচনে জটিল থেকে সরল উপাদান তৈরিতে বড়ো ভুমিকা পালন করে। কোনো কারণে যদি এই অ্যাসিড বের হওয়ার পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় সেটি পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে ক্ষত তৈরি করে। যেটি অনেকদিন ধরে হতে থাকলে পেপটিক আলসার (peptic ulcer)-এর রূপ নেয়।

কী কী কারণে এই ক্ষত তৈরি হয়?

পাকস্থলীর মধ্যকার সবচেয়ে বাইরে একধরনের আস্তরণ থাকে যা প্রধানত এই অ্যাসিডের হাত থেকে ভিতরের অংশকে রক্ষা করে। যদি এই আস্তরণ বা পর্দাটা ফুটো হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে আলসার দ্রুত আরও ভিতরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্যাস্ট্রিক আলসার হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি নামে একধরনের ব্যাকটিরিয়া এবং নন-স্টেরয়ডাল

অ্যান্টিইনফ্লামেটরি (NSAID) ওষুধের জন্য হয়ে থাকে। হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি পাকস্থলীর ভিতরের পর্দাতে প্রদাহ তৈরি করে, ফলে পাকস্থলীটি অ্যাসিড ক্ষরণের সময় তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এনএসএআইডি (NSAID) হল ব্যথা উচ্চতাপমাত্রা এবং প্রদাহ কমানোর জন্য ব্যবহার করা ওষুধ যেমন—আইব্রুফেন, অ্যাসপিরিন, ডিক্লোফেনক, অ্যাসিক্লোফেনক, এটোর‍্যাটক্সিবইত্যাদি, যা আলসার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া অতিরিক্ত মানসিক ও শারীরিক চাপ, অতিরিক্ত ঝাল মশলাদার খাবার, ধূমপান ও মদ্যপান আলসার তৈরি হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এবং চিকিৎসায় উন্নতির হার কমিয়ে দেয়।

গ্যাস্ট্রিক ও ডিয়োডিনাল আলসার

গ্যাস্ট্রিক আলসারের ক্ষেত্রে অ্যাসিডের বিরুদ্ধে পাকস্থলীর ভিতরের পর্দার প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাওয়ার জন্য এবং ডিয়োডিনাল আলসারের ক্ষেত্রে অ্যাসিডের ক্ষরণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আলসার তৈরি হয়। গ্যাস্ট্রিক আলসারের মোটামুটি শতকরা ৭৫ ভাগ, আর ডিয়োডিনাল আলসারের মোটামুটি শতকরা ৯০ ভাগে হেলিকোব্যাকটর

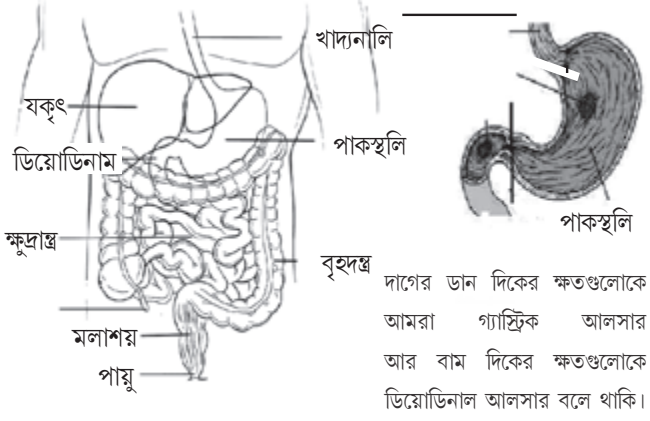

দাগের ডান দিকের ক্ষতগুলোকে আমরা গ্যাস্ট্রিক আলসার আর বাম দিকের ক্ষতগুলোকে ডিয়োডিনাল আলসার বলে থাকি।

চিত্র ১. গ্যাস্ট্রিক ও ডিয়োডিনাল আলসার

পাইলোরি জীবাণু পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক আলসার খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার জন্য রোগী খাবার খেতে পারেন না, তাই দ্রুত ওজন হ্রাস হতে থাকে। আবার ডিয়োডিনাল আলসারে খাবার খাওয়ার পর ব্যথা কমে যায়, তাই রোগীর খাবারের অনীহা বা ওজন কমে যাওয়া খুব একটা হয় না। গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে ক্যান্সার তৈরি হওয়ার সামান্য সম্ভবনা থাকলেও ডিয়োডিনাল আলসারে এর সম্ভাবনা নেই।

কখন বুঝবেন ডাক্তারের কাছে যাওয়া অত্যাবশ্যক?

ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশের মানুষজন ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চেয়ে ওষুধের দোকানে যাওয়া বেশি পছন্দ করেন। পেপটিক আলসারই হোক বা অন্য কোনো উপসর্গ থাকুক সাধারণত রোগী প্রথম পর্যায়ে ডাক্তারের কাছে এসে পৌঁছায় না। তার কারণ এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।

সর্ব প্রথম পেটে ব্যথা দিয়ে শুরু। এই ব্যথা পেটের উপর থেকে মাঝামাঝি জায়গা পর্যন্ত হয়, যেটি আরও উপরের দিকে গলা, পিছনের দিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যথাটার চরিত্র খানিকটা জ্বালা করার মতো। এছাড়াও খাবার খেতে ইচ্ছে না হওয়া, ওজন কমে যাওয়া এসব উপসর্গ ও লক্ষণ থাকে। তবে যে উপসর্গগুলি হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের কাছে এসে পৌঁছোনো উচিত সেগুলি হল--রক্তবমি, খুব নরম কালচে পায়খানা, পেটে খুব ব্যথা। রক্তবমির কারণ হল আলসার পাকস্থলীর দেওয়ালের অনেক গভীরে পৌঁছে সরু সরু রক্তনালির গায়ে ক্ষত তৈরি করে দেয়। পায়খানা দিয়েও রক্ত বেরিয়ে আস্তে পারে, কিন্তু সেই রক্ত গাঢ় লাল রঙের হয় না, রক্ত মলের সঙ্গে মিশে থাকে এবং পায়খানার রং কালচে হয়।

রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পর্যায়

ক্লিনিক্যালি রোগটি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা তৈরি হলেও, যেহেতু হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি সংক্রমণজনিত আলসার হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাই ব্যাকটিরিয়ার উৎস জানার জন্য প্রথমত ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট (urea breath test) করা হয়; এক্ষেত্রে একধরনের রাসায়নিক মিশ্রিত পানীয় রোগীকে খাওয়ানো হয়। যেটি হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি দ্বারা পাকস্থলীতে ভেঙে গিয়ে ইউরিয়া তৈরি করে, প্রস্রাবে যার উপস্থিতি দেখে হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি-র উপস্থিতি প্রমাণ করা হয়। স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্ট (stool antigen test) : অল্প পরিমাণে মল পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাকটিরিয়ার অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়।

রক্ত পরীক্ষা: ব্যাকটিরিয়ার বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য শরীর একধরনের প্রোটিন তৈরি করে, যাকে আমরা অ্যান্টিবডি বলি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্তে এই ধরনের অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়।

গ্যাস্ট্রোস্কোপি: এই পরীক্ষার মাধ্যমে খাদ্যনালীর মধ্যে একধরনের নল ঢুকিয়ে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য কোনো ক্ষত আছে কিনা লক্ষ করা হয়। এই নলের মাথায় এক ধরনের ক্যামেরা ও লাইট লাগানো থাকে যার দ্বারা গৃহীত প্রতিচ্ছবি বাইরে টিভি স্ক্রিনে দেখতে পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা করার জন্য রোগীকে অল্প পরিমাণে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয় এবং লোকাল অ্যানাস্থেটিক গলার মধ্যে দেওয়া হয় যাতে করে নল ঢোকাতে গেলে রোগীর ব্যথা কম হয়। এক্ষেত্রে একটা সুবিধা

হল ক্ষতের জায়গা থেকে অল্প পরিমাণে কোষ (tissue) নিয়ে তার মধ্যে হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি ব্যাকটিরিয়া আছে কিনা পরীক্ষা করতে হয়। পরীক্ষা করার ৬-৮ ঘণ্টা আগে থেকে খাবার খাওয়া বন্ধ রাখা হয়, যাতে পাকস্থলী পুরোপুরি ফাঁকা থাকে। পরীক্ষাটি করতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে।

চিকিৎসা পদ্ধতি—সুস্থ হয়ে ওঠার উপায়

চিকিৎসা পদ্ধতি মূলত আলসারের কারণ অনুযায়ী ঠিক করা হয়। যদি হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি সংক্রমণের জন্য আলসার হয় তবে অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স ও পিপিআই গোত্রের ওষুধ দেওয়া হয়। যদি হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি এবং এনএসএআইডিএস, দুই কারণের জন্য আলসার তৈরি হয় তাহলেও উপরের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যদি আলসার শুধুমাত্র এনএসএআইডিএস-এর জন্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে শুধু পিপিআই গোত্রের ওষুধের কোর্স দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে পিপিআই-এর বিকল্প হিসাবে এইচ-২ রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ব্যবহার করা হয়। সঙ্গে অতিরিক্ত হিসাবে অ্যান্টাসিড দেওয়া হয় অল্প সময়ের মধ্যে উপসর্গ কমানোর জন্য।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ৪-৬ সপ্তাহ পরে আরেকবার গ্যাস্ট্রোস্কোপি করে আলসার শুকিয়েছে কিনা দেখা যেতে পারে।

এইসময় মদ্যপান, ধূমপান, মশলাদার খাবার, অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে বিরত থাকলে আলসার শুকিয়ে যাওয়ার ও উপসর্গ তাড়াতাড়ি কমার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

হেলিকোব্যাকটর পাইলোরি ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণের জন্য দু-তিন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিনে দু-বার করে এক সপ্তাহ দেওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে অ্যামোক্সিসিলিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, মেট্রোনিডাজোল ব্যবহৃত হয়।

প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর বা সংক্ষেপে পিপিআই (PPI)

এগুলি প্রধানত পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে অ্যাসিড নিঃসরণকে কমিয়ে দেয়, যাতে করে আলসার নিজে থেকেই শুকোতে পারে। এগুলি ৪-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত দেওয়া হয়। যে পিপিআইগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল ওমিপ্রাজোল, প্যান্টোপ্রাজোল, ল্যান্সোপ্রাজোল, র‍্যাবেপ্রাজোল। যদিও এগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম তবে পায়খানা কষে যাওয়া, মাথা ব্যথা হতে পারে।

এইচ-২ রিসেপ্টর ব্লকার (H_2 Receptor Blocker)

এগুলিও অ্যাসিড নিঃসরণকে কমায় তবে পিপিআই-এর চেয়ে কম ক্ষমতাশালী। যেমন—র‍্যানিটিডিন, ফ্যামোটিডিন, সিমেটিডিন। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে মাথা ব্যথা, দুর্বলভাব কিছু সময় হতে পারে।

অ্যান্টাসিড ও অ্যালজিনেট

উপরের ওষুধগুলো কাজ করতে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। তাই অনেকসময় অতিরিক্ত হিসাবে অ্যান্টাসিড ব্যবহার করা হয়। যা নিঃসৃত অ্যাসিডকে প্রশমিত করে এবং তৎক্ষণাৎ উপসর্গের উপশম হয়।

কিছু অ্যান্টাসিডের মধ্যে অ্যালজিনেট নামে এক ধরনের ওষুধ আছে যা আলসারের (ক্ষত) চারপাশে একটি সুরক্ষাপ্রদানকারী স্তর তৈরি করে ক্ষত শুকোতে সাহায্য করে। এগুলো খাবার খাওয়ার পর দেওয়া হয়। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে কষা পায়খানা বা পাতলা পায়খানা হতে পারে।

যদি ব্যথা কমানোর জন্য এনএসএআইডিএস ব্যবহৃত হয়, তাহলে আলসার (ক্ষত) তৈরির সম্ভাবনা কমানোর জন্য পিপিআই বা এইচ-২ রিসেপ্টর ব্লকার ব্যবহার করা উচিত, না হলে অন্য ধরনের ব্যথার ওষুধ, যেগুলিতে আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, যেমন—প্যারাসিটামল ব্যবহার করা উচিত। যদি রোগী অ্যাসপিরিনজাতীয়

> পেটে ব্যথা দিয়ে শুরু। . . . এই ব্যথাটার চরিত্র খানিকটা জ্বালা করার মতো। এছাড়াও খাবার খেতে ইচ্ছে না হওয়া, ওজন কমে যাওয়া এসব উপসর্গ ও লক্ষণ থাকে।

ওষুধ নেন, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তা বন্ধ করা অথবা সঙ্গে পিপিআই বা এইচ-২ রিসেপ্টর ব্লকার নেওয়া উচিত।

পেপটিক আলসার থেকে কী কী জটিলতা হতে পারে?

প্রথমত অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ

আগেই আলোচনা করেছি যে আলসার (ক্ষত) অনেক গভীরে পৌঁছে গেলে রক্তনালীর দেওয়াল থেকে রক্তক্ষরণ পর্যন্ত হতে পারে।

অল্প পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে রক্তপাত হলে রোগী রক্তাল্পতায় ভুগতে পারেন। যার ফলে দুর্বল হয়ে পড়া, হৃৎপিণ্ডের গতিবৃদ্ধি হয়ে যাওয়া, বসা থেকে হঠাৎ উঠলে চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যাওয়া—এইসব হতে দেখা যায়।

তবে দ্রুত ও অতিরিক্ত রক্তপাত দুইভাবে জটিলতা সৃষ্টি করে। প্রথমত, বমির সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসা, যাকে হেমাটেমেসিস (hematemesis) বলা হয়। দ্বিতীয়ত কালো পায়খানা হওয়া, যাকে ম্যালেনা (malena) বলা হয়। এরকম ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত। চিকিৎসা হিসাবে যা করা হয়

তা হল এন্ডোস্কোপি (endoscopy)-র মাধ্যমে রক্তক্ষরণের জায়গায় তঞ্চনকারী পদার্থের মাধ্যমে বা যে শিরা থেকে রক্তপাত হচ্ছে তার রক্ততঞ্চন করা হয়। শরীরে রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেলে রোগীকে বাইরে থেকে শরীরে রক্ত দিতে হয়।

পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রের ফুটো হয়ে যাওয়া

অনেকসময় আলসার গভীর হতে হতে ছিদ্র তৈরি করে। যাকে আমরা বলি পারফোরেশন (perforation)। এক্ষেত্রে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যকার ব্যাকটিরিয়া পেটের মধ্যে চলে যায়। ফলে পেটের মধ্যে ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ হয়। এই সংক্রমণ আবার রক্তের মাধ্যমে

এইসময় মদ্যপান, ধূমপান, মশলাদার খাবার, অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে বিরত থাকলে আলসার শুকিয়ে যাওয়ার ও উপসর্গ তাড়াতাড়ি কমার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থাকে সেপসিস (sepsis) বলে। এরকম ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হয় এবং শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়।

পাকস্থলী থেকে খাদ্য বেরোনোর পথে বাধা

(Gastric outlet obstruction)

অনেকসময় আলসারের চারপাশে প্রদাহ বা নতুন করে কোষ বৃদ্ধির ফলে একধরনের এবড়োখেবড়ো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যার ফলে সাধারণত খাবার যেভাবে নীচের দিকে খাদ্যনালী থেকে নেমে আসে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাকে আমরা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন বলি। এরকম ক্ষেত্রে রোগীর যে উপসর্গগুলি লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল—অতিরিক্ত বমি করা, যার মধ্যে বেশিরভাগ অপাচিত খাদ্য বেরিয়ে আসে। খাবার খাওয়ার প্রতি অনীহা তৈরি হয় ও তার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর ওজন কমে যায়।

এন্ডোস্কোপি করে বাধা বা অবস্ট্রাকশন-এর অবস্থান ও কী ধরনের বাধা তা জানা যায়। যদি এটা প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে পিপিআই বা এইচ-২ ব্লকার দিয়ে অবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়। আর যদি এবড়োখেবড়ো কোষ তৈরির জন্য হয়ে থাকে, তখন অপারেশনের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তোলা হয়। অনেকসময় একধরনের বেলুন ওই জায়গায় ফুলিয়ে, জায়গার পরিধি বাড়িয়ে, খাবার চলাচলকে বাধামুক্ত করা হয়।

সর্বোপরি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডাক্তারের কাছে পৌঁছোতে পারলে সাধারণত জটিলতা দূর করা খুব একটা কঠিন নয়। তবে জটিলতা যদি বেশি হয় সেটি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দীপংকর জানা, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

শিরার মধ্যে রক্ত জমে যাওয়া (ডিভিটি)

ডা. কুশল সেন

আমাদের শরীরে দু-রকমের শিরা থাকে, একধরনের শিরা চামড়ার কাছাকাছি থাকে এদের বলা হয় সুপারফিশিয়াল ভেইন বা উপরিস্থিত শিরা, আর একধরনের শিরা একটু গভীরে অবস্থান করে। এদের বলা হয় ডীপ ভেইন বা গভীর শিরা। যদি শরীরের কোনো গভীর শিরার (বিশেষ করে যে শিরাগুলো উরু ও পায়ের ডিমের মাংসপেশির মধ্য দিয়ে রক্ত নিয়ে যায়) ভিতরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে ওই শিরায় রক্ত চলাচলে অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে তাকে বলে—ডিভিটি বা ডীপ ভেইন থ্রম্বোসিস।

রোগী পা ফোলা আর পায়ে ব্যথা নিয়ে আসলেও ডাক্তারদের দুশ্চিন্তা থাকে অন্যদিকে। এই জমাট বাঁধা (তঞ্চিত) রক্তের দলা ভেঙে রক্তস্রোতে ভেসে ফুসফুসের কোনো একটা রক্তনালী বন্ধ করে দিয়ে

একটি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে, যাকে বলে পালমোনারি এম্বোলিজম। ডিভিটি আর পালমোনারি এম্বোলিজম-কে একসাথে ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম বলে।

ডি ভি টি-র উপসর্গ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই রোগের কোনো উপসর্গই থাকে না। যে উপসর্গগুলো সাধারণভাবে দেখা যায় সেগুলো হল—

- একটা পায়ের ডিমের মাংসপেশিতে ফোলা, ব্যথা বা চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হওয়া।
- ক্ষতিগ্রস্ত যায়গায় অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভূত হওয়া।
- যে জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধেছে সেখানের চামড়ার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।
- হাঁটুর নীচে পায়ের পিছনে চামড়া লাল হয়ে যাওয়া।
- ডিভিটি সাধারণত (যদিও সবসময় নয়) একটা পায়ে হয়।

ডিভিটি-র আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল যখন আপনি পায়ের পাতা হাঁটুর দিকে মুড়বেন, সেই সময় ব্যথা বাড়বে।

জটিলতা

ডিভিটি রোগের দু-টি জটিলতা হল পালমোনারি এম্বোলিজম এবং থ্রম্বাস হয়ে যাওয়ার পরের লক্ষণসমূহ (পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম)।

পালমোনারি এম্বোলিজম

এটি হল এই রোগের সব চাইতে মারাত্মক জটিলতা। ডিভিটি-র চিকিৎসা না করে ফেলে রেখে দিলে ১০ জনে ১ জনের এই পালমোনারি এম্বোলিজম হয়। এই অবস্থায় জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। এতে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো দেখা যেতে পারে —

- শ্বাসকষ্ট — যেটা ধীরে ধীরে আসতে পারে বা হঠাৎ করে প্রচণ্ড বেড়ে যেতে পারে।
- বুকে ব্যথা — যেটা শ্বাস নেওয়ার সময় বাড়ে।
- হঠাৎ করে মৃত্যু — বড়ো আকারের দলা ফুসফুসে রক্ত চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে ফুসফুস চুপসে দিতে পারে; হৃদ্‌যন্ত্রের পাম্প করার ক্ষমতা তখন কাজ করে না, ফলে মৃত্যু হতে পারে।

ডিভিটি এবং পালমোনারি এম্বোলিজম উভয় ক্ষেত্রেই আপৎকালীনভাবে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

যদি আপনি পায়ের মাংসপেশিতে ফোলা, ব্যথা বা চাপ দিলে ব্যথা অনুভব হওয়া কিংবা এর সাথে শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করেন, শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম

ডিভিটি রোগীদের ২০%-৪০% এর ক্ষেত্রে পায়ের ডিমের মাংশপেশিতে বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। একে পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম বলে।

যদি আপনার ডিভিটি থাকে, জমাট বাঁধা রক্ত পায়ের শিরার রক্ত চলাচলকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়, ফলত অন্য শিরাগুলোতে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এতে পায়ের মাংসপেশির ক্ষতি হয়। এর ফলে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় সেগুলো হল—

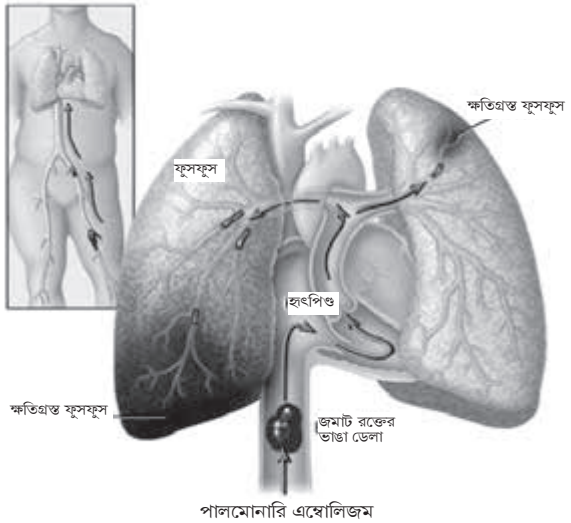

পালমোনারি এম্বোলিজম

- পায়ের ডিমের পেশিতে ব্যথা।
- ফোলা।
- র‍্যাশ।
- পায়ের ডিমের পেশিতে ঘা।

যখন ডিভিটি আপনার জঙ্ঘার শিরাতে দেখা দেয় অথবা যদি আপনি স্থূল হন এবং আপনার একই পায়ে একাধিক ডিভিটি থেকে থাকে, তবে পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

ডিভিটি কী থেকে হয়?

ডিভিটি হওয়ার সেরকম কোনো কারণ আলাদা করে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মূলত চল্লিশোর্ধ ব্যক্তিদের এই রোগ দেখা যায়। বয়স ছাড়াও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে ডিভিটি হওয়ার ভয় বেশি থাকে।

নিষ্ক্রিয়তা

যখন আপনি হাঁটাচলা কম করেন, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনার শরীরের রক্ত আপনার দেহের নিম্নভাগে, মূলত পায়ে জমা হতে চেষ্টা করে। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই কারণ আপনি যখনই হাঁটতে শুরু করবেন রক্তচলাচল বাড়বে এবং সমানভাবে আপনার শরীরের সর্বত্র রক্ত পৌঁছে যাবে।

কিন্তু যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে হাঁটাচলা করতে অক্ষম থাকেন—যেমন অস্ত্রোপচারের পর, কোনো অসুস্থতা কিংবা আঘাতের পর অথবা দীর্ঘ যাত্রার পর—আপনার শরীরের রক্তচলাচলের গতি হ্রাস পাবে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত গতির রক্ত জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা তৈরি করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

হাসপাতালে

যদি আপনি কোনো অস্ত্রোপচার বা অন্য কিছুর জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন, আপনার শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কারণ, অসুস্থতা, শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় বা কম সক্রিয় থাকার সময়ে ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

রোগী হিসাবে, আপনার চিকিৎসার ধরনের উপর ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে। ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা নিম্নিলিখিত ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে—

- যদি আপনার অস্ত্রোপচারের সময় ৯০ মিনিটের বেশি হয় কিংবা পা, নিতম্ব বা পেটের অপারেশনের সময়সীমা ৬০ মিনিট ছাড়িয়ে যায়।
- যদি আপনার অস্ত্রোপচার শরীরের কোনো প্রদাহ নিবারণের জন্য (যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস) করা হয়, বা পেটের কোনো অপারেশন করা হয়।
- যদি আপনি শয্যাশায়ী থাকেন, হাঁটাচলা না করতে পারেন, অথবা টানা তিনদিনের বেশি সময়, দিনের অধিকাংশ সময় চেয়ারে বা বিছানাতে অতিবাহিত করেন।

এছাড়াও, যদি আপনি কোনো অপারেশন বা মারাত্মক আঘাতের কারণে স্বাভাবিকের থেকে কম সক্রিয় থাকেন এবং আপনার দেহে ডিভিটি হওয়ার অন্যান্য ভয়ের কারণগুলো বর্তমান থাকে, কিংবা আপনার পরিবারে ডিভিটি-র ইতিহাস বর্তমান থাকে তাহলেও আপনার ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি হবে।

অস্ত্রোপচারের পর, কোনো অসুস্থতা কিংবা আঘাতের পর অথবা দীর্ঘ যাত্রার পর—আপনার শরীরের রক্তচলাচলের গতি হ্রাস পাবে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত গতির রক্ত জমাট বাঁধা রক্তের ডেলা তৈরি করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

তাই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই আপনার ডিভিটি হওয়ার প্রবণতার পরিমাপ করে প্রয়োজনে ডিভিটি প্রতিরোধক চিকিৎসা চালু করে দিতে হবে।

রক্তনালীর ক্ষতি

যদি রক্তনালীর দেওয়ালের কোনো ক্ষতি হয়, এটা সরু বা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেই রক্তনালীতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে।

রক্তনালী ভাঙা হাড়, পেশিতে জোরে আঘাত এই সব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কখনো কখনো অস্ত্রোপচারের সময় রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে, বিশেষত শরীরের নীচের অংশের অস্ত্রোপচারের সময়।

রক্তনালীর প্রদাহ বা ভাস্কুলাইটিস, ভেরিকোস ভেইন বা কুঁকড়ে যাওয়া শিরা, এবং কিছু চিকিৎসা যেমন ক্যান্সার রোগে কেমোথেরাপি, রক্তনালীর ক্ষতি করতে পারে।

কিছু শারীরিক ও জিনঘটিত রোগ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আপনার শরীরে ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়—

★ ক্যান্সার রোগীদের কেমোথেরাপি বা রেডিয়োথেরাপির সময় ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

★ ফুসফুস এবং হৃদ্‌পিণ্ডের রোগে।

★ যকৃতের প্রদাহ, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস।

★ রক্তে অনুচক্রিকার আধিক্য—এই জিনঘটিত রোগে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা বাড়ে।

★ অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিন্ড্রোম—শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে হওয়া রোগ, যাতে রক্ত স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে।

গর্ভবতী মা

সন্তানসম্ভবা মায়েদের রক্ত সহজেই জমাট বেঁধে যায়। সন্তান জন্মের সময় বেশি রক্তক্ষরণ আটকানোর এটা একটা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া।

লাখ প্রতি একজন গর্ভবতী মায়েদের ভেনাস থ্রম্বোএম্বোলিজম দেখা দেয়। প্রসূতি অবস্থায় একই বয়সের সাধারণ মহিলার চেয়ে রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা ১০গুণ বেশি থাকে।

যদি থ্রম্বোফিলিয়া বা রক্তে অণুচক্রিকার আধিক্য থাকে এবং পরিবারে থ্রম্বোসিসের ইতিহাস থাকে তবে প্রসূতি অবস্থায় ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

এছাড়া—

- ☞ ৩৫ এর বেশি বয়স হলে।
- ☞ যদি স্থূল হন।
- ☞ দুই বা ততোধিক সন্তান হলে।
- ☞ সিজারিয়ান সেকশন করে বাচ্চা হলে।
- ☞ দীর্ঘকালীন চলাচল বা হাঁটাহাঁটি বন্ধ থাকলে।
- ☞ ধূমপান করলে।
- ☞ ভেরিকোস ভেইন থাকলে।
- ☞ ডিহাইড্রেশন থাকলে।

ডিভিটি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। এক্ষেত্রে কম আণবিক ওজনের হেপারিন (LMWH) ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়, যেটা সন্তানের শরীরে কোনো প্রভাব ফেলে না।

গর্ভনিরোধক বড়ি ও হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা (Hormone Replacement Therapy)

ইস্ট্রোজেন নামক স্ত্রী হরমোন উপস্থিত থাকায় রক্ত স্বাভাবিকের চেয়ে তাড়াতাড়ি জমাট বেঁধে ডিভিটি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

অন্যান্য কারণ

যদি আপনি—

- ▲ ধূমপান করেন;
- ▲ আপনার ওজন বেশি হয় বা আপনি স্থূল হন;
- ▲ আপনার বয়স ষাট বা তার বেশি হয়;
- ▲ যদি আপনি ডিহাইড্রেটেড থাকেন;
- ▲ আপনার পরিবারে বা আপনার আগে ডিভিটি হওয়ার ইতিহাস বর্তমান থাকে;

তবে আপনার ডিভিটি-তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ডিভিটি রোগ নির্ণয় কীভাবে করে

সাধারণত ক্লিনিকাল পরীক্ষা দিয়ে ডিভিটি হয়েছে সন্দেহ হলে নিম্নলিখিত ল্যাবরেটরির পরীক্ষাগুলো রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে—

ডি-ডাইমার টেস্ট

যদি কেবলমাত্র রোগের উপসর্গ দেখে রোগনির্ণয় করা না যায় তবে এই বিশেষ রক্ত পরীক্ষাটি ডাক্তারের পরামর্শ মতো করা যেতে পারে।

এই পরীক্ষাটি রক্তস্রোতে ভাসমান জমাট রক্তের ভাঙা টুকরো আছে কিনা তা জানতে সাহায্য করে। এর সাংখ্যমান যত বেশি হবে শিরায় জমাট রক্তের ডেলা থাকার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

তবে এই পরীক্ষাটির ফলাফল সবসময় বিশ্বাসযোগ্য হয় না—কারণ অস্ত্রোপচারের পর, গর্ভবতী অবস্থায়, আঘাতের পর রক্তে ডি-ডাইমার-এর পরিমাণ বেশি থাকে। আর এই পরীক্ষার খরচও অনেক। তাই ইউএসজি-র মতো অন্যান্য পরীক্ষা করে ডিভিটি রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা হয়।

ইউএসজি স্ক্যান

ইউএসজি পরীক্ষা করে শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে কিনা জানা যায়। ডপ্লার আল্ট্রাসাউন্ড একটি বিশেষ ধরনের ইউএসজি যা রক্তনালীর মধ্য দিয়ে কত জোরে রক্ত যাচ্ছে তা জানায়। এই পরীক্ষা দিয়ে শরীরের কোনো রক্তনালীতে রক্তের গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে কি না বা রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি না তা জানায়।

ভেনোগ্রাম

যদি ডি-ডাইমার বা ইউএসজি পরীক্ষা করে ডিভিটি রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা না যায়, তবে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে।

পায়ের শিরার মধ্যে এক্স-রে-তে দেখা যায় এরকম একধরনের রং (ডাই) দিয়ে এক্স-রে করে দেখা হয়। রক্তের সঙ্গে দ্রবীভূত ডাই পায়ের শিরা বরাবর উপরে ওঠে আর রক্তনালীর গঠন এক্স-রে-তে পরিষ্কার বোঝা যায়। কোথাও জমাট রক্তের ডেলা থাকলে সেখানে একটা ফাঁকা জায়গা বা গ্যাপের সৃষ্টি হয়। সেটা দেখে বোঝা যায় ডিভিটি হয়েছে কি না।

ডিভিটি রোগের চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হল রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতাকে কমানো, তাই এই রোগের ওষুধ হল মূলত রক্ত তরল রাখার ওষুধ, যেটা রক্তকে জমাট বাঁধা থেকে আটকায় আর জমাট বেঁধে যাওয়া রক্তকে আর বাড়তে না দিয়ে আস্তে আস্তে গলিয়ে ফেলে। এই ওষুধগুলোকে রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক বা অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট বলে। সহজ ভাষায় এদের ব্লাড থিনার বা রক্ত তরল করার ওষুধ বললেও এরা কিন্তু রক্তকে পাতলা করে না। এরা একধরনের প্রোটিন যারা সহজে রক্তকে জমাট-বাঁধা থেকে আটকায়।

হেপারিন আর ওয়ারফারিন হল এরকম দু-ধরনের রক্ত তরল করার ওষুধ যেটা ডিভিটি-তে ব্যবহার করা হয়। হেপারিন তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে বলে এটা দিয়ে চিকিৎসার শুরু করা হয়। প্রাথমিকভাবে কয়েকদিন হেপারিন দিয়ে চিকিৎসা করার পরে ওয়ারফারিন খাওয়া শুরু করতে হয়, হেপারিন বন্ধ করে।

এছাড়াও রিভারক্সাব্যান, এপিক্সাব্যান ইত্যাদি সরাসরিভাবে কাজ করা মুখে খাওয়ার রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক (directly acting oral anticoagulants, DOACS/ novel oral anticoagulants, NOACS) ওষুধও এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এগুলোর কার্যকরী ক্ষমতা হেপারিন বা ওয়ারফারিনের মতো হলেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম।

এই ওষুধগুলো সম্পর্কে অল্প করে কিছু জেনে নেওয়া যাক—

হেপারিন

হেপারিন দু-ধরনের হয়:

একটা সাধারণ হেপারিন বা আনফ্র্যাক্সনেটেড হেপারিন আর কম আণবিক ওজনের হেপারিন বা লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন। সাধারণ হেপারিন হয় সরাসরি শিরার মধ্যে দেওয়া হয় বা পাম্পের সাহায্যে টানা দীর্ঘ সময় ধরে আস্তে আস্তে সরু পাইপের ভিতর দিয়ে শিরার মধ্যে দেওয়া হয়, একে ইনফিউশন ড্রিপ বলে (এটা হাসপাতালেই দিতে হয়)। অথবা চামড়ার নীচের চর্বিতেও (সাবকিউটেনিয়াস) দেওয়া হয়। কম আণবিক ওজনের হেপারিন সাধারণত চামড়ার নীচের চর্বিতেই (সাবকিউটেনিয়াস) দেওয়া হয়।

ওষুধের মাত্রা রোগী বিশেষে আলাদা, ফলত হেপারিন শুরু করার প্রথম পাঁচ থেকে দশ দিন হাসপাতালে ভর্তি থেকেই নিতে হয়, এবং ঘন ঘন রক্ত পরীক্ষা করে ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

কম আণবিক ওজনের হেপারিন একটু আলাদাভাবে কাজ করে, তাই এটা নেওয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় না বা ঘন ঘন রক্তপরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয় না।

তবে দুই ধরনের হেপারিনেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছ—

- চামড়ায় র‍্যাশ;
- শরীরের বিভিন্ন যায়গা থেকে রক্তক্ষরণ, কেটে গেলে রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়া;
- হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়া;
- কখনো কখনো হেপারিন রক্তের জমাট-বাঁধার ধর্মকে এমনভাবে বদলে দেয় যে জমাট-বাঁধা রক্তের ডেলাগুলো আরও ক্ষতিকর অবস্থায় চলে যায়। কম আণবিক ওজনের হেপারিনে এর সম্ভাবনা কম।
- কম আণবিক ওজনের হেপারিনই এখন বেশি ব্যবহৃত হয় কারণ এটা দেওয়া সহজ আর এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণ হেপারিনের চেয়ে কিছুটা হলেও কম।

ওয়ারফারিন

এটা বড়ি আকারে পাওয়া যায় এবং মুখে খাওয়া যায়। হেপারিন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপর এই বড়ি খাওয়া হয় যাতে নতুন করে জমাট রক্তের ডেলা আর তৈরি না হয় । তিন থেকে ছয় মাস প্রথমত খেতে হয় এই বড়ি, তবে কারও কারও ক্ষেত্রে সারাজীবনও খেতে হতে পারে।

হেপারিনের মতোই ওয়ারফারিনের মাত্রাও রোগী বিশেষে আলাদা

হয়। তাই ওষুধের মাত্রা ঠিক রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তরে রক্ত পরীক্ষা করতে হয়।

আপনার খাওয়া-দাওয়া, এর সঙ্গে ওষুধ খাওয়া, আপনার লিভারের কার্যক্ষমতা ইত্যাদির উপর ওয়ারফারিন কী মাত্রায় কাজ করবে তা নির্ভর করে।

ওয়ারফারিন খেলে আপনার নিম্নলিখিত জিনিস করা উচিত:

- খাদ্যতালিকা নির্দিষ্ট রাখা;
- মদ্যপান না করা;
- একই সময় রোজ ওষুধ খাওয়া;
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অন্য ওষুধ শুরু না করা;
- আয়ুর্বেদিক ওষুধ না খাওয়া;
- গর্ভবতী মা-দের ওয়ারফারিন দেওয়া যায় না, তাদের হেপারিন-ই দিতে হয়।

রিভোরক্সাব্যান

এই ওষুধ বড়ি আকারে পাওয়া যায় এটা রক্ততঞ্চনকারী ফ্যাক্টর Xa-কে কাজ করতে আটকায়, এবং থ্রম্বিন তৈরিতে বাধা দিয়ে রক্তকে জমাট-বাঁধার থেকে আটকায়। তাই ডিভিটি ও পালমোনারি এম্বোলিজম হওয়া আটকাতে এই ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা টানা ৩ মাস করতে হয়। প্রথম ২১ দিন দিনে দুটো করে বড়ি খেতে হয়, তারপর থেকে দিনে একটা করে চিকিৎসা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেয়ে যেতে হয়।

এপিক্সাব্যান

ডিভিটি ও পালমোনারি এম্বোলিজম আটকাতে রিভোরক্সাব্যানের মতো এপিক্সাব্যানও একই রকমভাবে কাজ করে। ৩ মাস ধরে চলা চিকিৎসায় এই ওষুধ রোজ দুটো করেই খেয়ে যেতে হয়।

পায়ের সঙ্গে চেপে বসে থাকা শক্ত মোজা বা কম্প্রেশান স্টকিং

আপনার ডিভিটি হয়ে থাকলে এইরকম কোনো বিশেষ মোজা আপনাকে দেওয়ার কথা, যদিও এরকম কোনো শক্তপোক্ত প্রমাণ নেই যে এই বিশেষ ধরনের মোজা আপনাকে পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম হওয়া থেকে উপকার দেয়, তবু ডাক্তারবাবু মনে করলে এইরকম মোজা আপনাকে ব্যবহার করার উপদেশ দিতে পারেন।

কম্প্রেশান ডিভাইস

কম্প্রেশন ডিভাইস হল একটা যন্ত্র পায়ের মধ্যে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা কাপড়ের ভিতরে থাকা বেলুন বাইরে থেকে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে রাখতে পারে। পায়ের শিরার উপরে নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে চাপের তারতম্য ঘটিয়ে এটা পায়ে রক্ত চলাচলের গতিকে একটু বাড়িয়ে দেয়। রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় যদি হাঁটাচলা না করতে পারেন তবে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যায়াম

রোজ নিয়ম করে হাঁটাচলা করা উচিত। এতে আপনার ডিভিটি-র উপসর্গগুলো ফিরে আসার সম্ভাবনা যেমন কমবে, তেমনই ডিভিটি-র জটিলতা যেমন পোস্ট থ্রম্বোটিক সিন্ড্রোম হওয়া আটকাবে।

পা তুলে বসা

যখনই আপনি বসছেন বা বিশ্রাম নিচ্ছেন পা তুলে বসতে হবে, এতে আপনার পায়ের শিরায় রক্ত জমা কমবে এবং পায়ের শিরার ভিতর রক্তের চাপ কমবে।

পা তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে পায়ের পাতা যেন নিতম্ব বা কোমড়ের উপরে থাকে। শোয়ার সময় পায়ের তলায় বালিশ দিয়ে পা উঁচু করে রাখা যায়। সম্ভব হলে বিছানার নীচের অংশ একটু উপরে তুলেও পা উঁচু করে রাখা যায়।

নিম্ন মহাশিরা ছাঁকনি

রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক চিকিৎসা সব সময় করা যায় না, বা সেই ওষুধ যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে বর্তমানে রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক ওষুধের পরিবর্তে নিম্ন মহাশিরা ছাঁকনির ব্যবহার করা হচ্ছে।

এরা হচ্ছে রক্তের শিরার মধ্যে বসানো যায় এরকম ছাঁকনি, যারা বড়ো রক্তের ডেলাকে ছেঁকে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসে যেতে বাধা দেয়। ফলত এই ছাঁকনি ডিভিটি, পালমোনারি এম্বোলিজম ইত্যাদি রোগীদের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধতে এবং জমাট-বাঁধা রক্ত রক্তনালীর মধ্যে ভেসে ফুসফুসে গিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করতে আটকায়।

শিরার মধ্যে এদের স্থায়ীভাবে বসানো যায় আবার এখন নতুন কিছু কিছু অস্থায়ী ধরনের ছাঁকনিও বাজারে পাওয়া যায়। লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে, চামড়া একটু কেটে শিরার মধ্যে দিয়ে সরু পাইপ (ক্যাথেটার) পাঠিয়ে সেই ক্যাথেটার এর ভিতর দিয়ে এই ছাঁকনি শিরার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়—এই পুরোটাই ইউএসজি দেখে দেখে করতে হয়।

ডিভিটি রোগের প্রতিরোধ

সাধারণ ভাবে দেখা গেছে যে দীর্ঘদিন ধরে যারা হাসপাতালে ভর্তি

থাকেন কোনো অস্ত্রোপচারের জন্য বা দীর্ঘমেয়াদি রোগের জন্য হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হয় যাদের তাদের ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই ভর্তি থাকাকালীন রোগীর ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করে হাসপাতালে যাওয়ার আগে এবং হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় পায়ের শিরায় যাতে জমাট রক্তের ডেলা তৈরি না হয় তার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

হাসপাতালে যাওয়ার আগে

গর্ভনিরোধক বড়ি বা হরমোন প্রতিস্থাপক চিকিৎসা বন্ধ করতে হবে (হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অন্তত ৪ সপ্তাহ আগে থেকে), যদি রোগী রক্ত জমাট-বাঁধা আটকানোর ওষুধ অ্যাস্পিরিন খান—সেটা অপারেশনের ৭ দিন আগে থেকে বন্ধ রাখতে হবে, লোকাল অ্যানাস্থেশিয়ায় ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ বা সম্পূর্ণ অ্যানাস্থেশিয়ার থেকে কম, সেটা ডাক্তারবাবু খেয়াল রাখবেন।

হাসপাতালে থাকার সময়

যদি রোগী ডিহাইড্রেটেড থাকেন, অর্থাৎ শরীরে জলের পরিমাণ কম থাকে তাহলে ডিহাইড্রেশন আটকাতে রোগীকে বেশি করে জল খেতে বলতে হবে, সম্ভব হলেই রোগী যাতে হাঁটাচলা করেন সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

ডিভিটি হওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে আর ব্যক্তিবিশেষে বেশ কিছু অপারেশনের পর রোগীকে রক্ততঞ্চন প্রতিরোধক ওষুধ যেমন ফন্ডাপেরিনক্স, ডাবিগ্যাট্রান ইত্যাদি কিংবা কম আণবিক ওজনের হেপারিন দিয়ে রাখতে হবে, তবে কিডনি বা বৃক্কের কার্যক্ষমতা কম থাকলে সাধারণ হেপারিন দেওয়া হয়। এছাড়া কম্প্রেশন স্টকিং বা কম্প্রেশন ডিভাইস ব্যবহার করা যেতে পারে।

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময়

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার সময় কিছু নির্দেশিকা মেনে চললে ডিভিটি আর তার জটিলতা আটকানো যায়, যেমন—

- সিগারেট না খাওয়া;
- সুষম খাবার খাওয়া, নিয়মমাফিক খাদ্যতালিকা মেনে চলা;
- নিয়মিত ব্যায়াম করা;
- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা বা স্থূল হলে ওজন কমানো;
- এরকম কোনো প্রমাণ নেই যে অ্যাস্পিরিন খেলে আপনার ডিভিটি হওয়া আটকাবে।

ভ্রমণকালীন সময়

প্লেনে, ট্রেনে বা বাসে দীর্ঘকালীন যাত্রা করার সময় কিছু সাধারণ পায়ের ব্যায়াম (পায়ের পাতা ওপর নীচ করা), নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটু ঘোরাফেরা করা, বেশি করে জল খাওয়া, অ্যালকোহল সেবন না করা, ইত্যাদি ডিভিটি হওয়া আটকাতে পারে।

প্রতি বছর ব্রিটেনে ২৫০০০ মানুষ আটকানো যায়—এরকম ডিভিটি-র জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমাদের দেশেও এর সংখ্যা কিছু কম নয়। কিছু ছোটো ছোটো জিনিস মাথায় রেখে চললেই এই রোগ হওয়ার আগেই আটকে দেওয়া যায় আবার একটু অসাবধানতা, আলস্য আপনাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে পারে। তাই এই রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করুন, ডিভিটি প্রতিরোধ করুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, একটি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত।

Advt.

‘অনীক’ পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। ‘অনীক’-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

আক্কেল দাঁত কখন তুলতে হয়?

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

আক্কেল দাঁত ব্যথায় অনেকেই ভোগেন। আক্কেল দাঁত বা তৃতীয় পেষক (মোলার) হল চোয়ালের শেষ দাঁত, বেরোয়ও সবার শেষে। ওপরের পাটি আর নীচের পাটির ডাইনে, বাঁয়ে মিলিয়ে চারটে আক্কেল দাঁত। কুড়ি বছরের আগে-পরে বেরোয় আক্কেল দাঁত। তার আগেই ওপর-নীচ মিলিয়ে ২৮টা দাঁত বেরিয়ে গেছে, তাই প্রায়ই ঠিকঠাকভাবে আক্কেল দাঁত বেরোনোর জায়গা থাকে না। তাতেই সমস্যা—লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার জনশিক্ষা-সামগ্রীর সহায়তায়।

আক্কেল দাঁত যখন ঠিকঠাক বেরোনোর জায়গা পায় না, তখন বেরোয় হয় বাঁকাভাবে, অথবা পুরোটা বেরোতে পারে না, আটকে যায়। এই আটকে যাওয়াটাকে বলা হয় ইম্প্যাকশন।

আক্কেল দাঁতে ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখান। দাঁতের ডাক্তার একটা এক্স-রে করে দেখে নেবেন আক্কেল দাঁতটা কী অবস্থানে আছে। তারপর বলবেন দাঁত তুলে ফেলতে হবে কি না।

কখন আক্কেল দাঁত তুলে ফেলতে হয়?

আক্কেল দাঁত বেরোয়নি কিন্তু কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, তাহলে তা তুলে ফেলার দরকার নেই। কিন্তু ইম্প্যাক্টেড আক্কেল দাঁত-এর পাশে খাবার আর ব্যাকটিরিয়া জমে একটা স্তর তৈরি করে যাকে বলা হয়

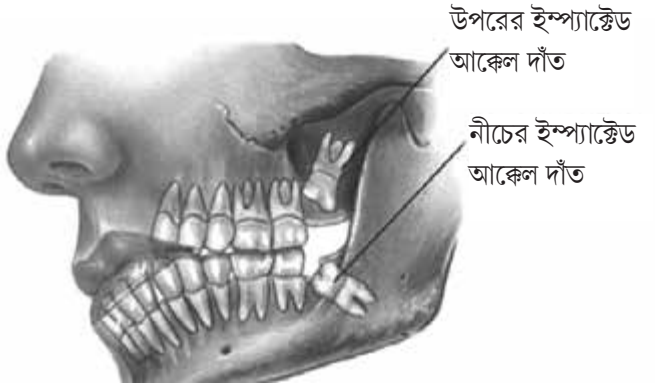

প্লেক। তা থেকে সমস্যা তৈরি হলে দাঁত তুলে ফেলতে হতে পারে। সমস্যাগুলো এই রকম হতে পারে:

- দাঁতের ক্ষয় বা ডেন্টাল কেরিজ—প্লেক দাঁতের ওপরের স্তরকে ক্ষইয়ে ফেলতে পারে, ক্ষয় থেকে গর্ত তৈরি হতে পারে।
- মাড়ীর ঘা বা জিঞ্জিভাইটিস—মাড়ী ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, ব্যথা করে। আক্কেল দাঁতের পাশের দাঁত বা চোয়ালের হাড়েরও ক্ষতি হতে পারে মাড়ীর ঘা থেকে।
- পেরিকরোনাইটিস—দাঁতের পাশের নরম কোষ-কলার জীবাণু সংক্রমণ।
- সেলুলাইটিস—গাল, জিভ বা গলায় জীবাণু সংক্রমণ।
- ফোঁড়া—জীবাণু সংক্রমণ থেকে আক্কেল দাঁত বা আশপাশের কোষ-কলায় পুঁজ জমা।
- সিস্ট—খুব কম কিছু ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্টেড আক্কেল দাঁতের গোড়ায় তরল ভর্তি থলি বা সিস্ট তৈরি হতে পারে।

অনেক সময় জীবাণুনাশক ওষুধ (অ্যান্টিবায়োটিক) ব্যবহার এবং অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে মুখ ধোয়ায় কিছু সমস্যা কমতে পারে। সমস্যা তাতে না কমলে আক্কেল দাঁত তোলা।

কীভাবে আক্কেল দাঁত তোলা হয়?

দাঁতের ডাক্তার অভিজ্ঞ হলে নিজের চেম্বারে দাঁত তুলে দিতে পারেন অথবা পাঠাতে পারেন বিশেষজ্ঞ হাসপাতালে।

দাঁতে কাজ করার আগে ডাক্তার অবশ করার ইঞ্জেকশন লাগিয়ে নেন। তবু দাঁত তোলার আগে তিনি যখন দাঁতটা আগে-পিছে নাড়িয়ে চোয়ালের গর্ত (টুথ সকেট)-টা বড়ো করে নেবেন, তখন চাপ অনুভব হতে পারে।

অনেক সময় দাঁতের ওপরের মাড়ীটা একটু কেটে নিতে হয়। অনেক সময় দাঁত টুকরো করে বার করতে হয়।

অবস্থা কতটা জটিল তার ওপর নির্ভর করে কতটা সময় লাগবে। অল্প কয়েক মিনিট থেকে মিনিট কুড়ি বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।

দাঁত তোলার পর কারুর কারুর মুখের ভেতরে ও বাইরে কিছুটা ফোলা থাকে—প্রথম তিনদিন বেশি, তারপর কমতে থাকে। কারুর সেরে উঠতে দু-সপ্তাহ সময়ও লাগতে পারে।

দাঁত তোলার পরে কী কী জটিলতা হতে পারে?

☞ জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে বা মাড়ী শুকোতে দেরি হতে পারে। সেরে ওঠার সময় যাঁরা ধূমপান করেন, তাঁদের এমন বেশি হয়।

☞ আরেকটা সম্ভাব্য জটিলতার নাম 'ড্রাই সকেট'। এতে মাড়ী বা চোয়ালে একটা একঘেয়ে ব্যথার অনুভূতি হতে পারে, অথবা তোলা দাঁতের গর্তে খারাপ গন্ধ বা স্বাদ আসতে পারে।

☞ অনেক সময় নার্ভে আঘাত লাগার ফলে জিভ, নীচের ঠোঁট, থুতনি, দাঁত ও মাড়ীতে ব্যথা বা ঝিনঝিনে ভাব—অসাড় ভাব হতে পারে। বেশির ভাগের এই সমস্যা সাময়িক হয়, কারুর কারুর স্থায়ীও হতে পারে।

চিকিৎসার খরচ কত?

যত বড়ো ডাক্তার, খরচ সাধারণত তত বেশি। তবে সরকারি ডেন্টাল কলেজে খরচ লাগার কথা নয়। তেমন হাসপাতাল এই রাজ্যে দুটো—কলকাতায় বি আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ আর শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

Advt.

কেন্দ্র সরকারের কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই।

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ

ডা. সুমিত দাশ

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ, বা ইংরাজিতে বললে জেনেরালাইজড অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার (Generalized Anxiety Disorder বা সংক্ষেপে GAD)। এই রোগের আলোচনায় যাওয়ার আগে আর একটা বিষয় দেখে নিই। ভয় (Fear) এবং উদ্‌বেগ (Anxiety)-র মধ্যে একটা পার্থক্য করা হয়। ভয় বলতে বোঝায় বাইরের পরিবেশের এমন একটা জিনিস যেটাতে সব মানুষই স্বাভাবিকভাবে বিপদের গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠবে, যেমন রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ দ্রুতগতিতে সামনে চলে আসা গাড়ি দেখলে যে অনুভুতি হয়। অপর দিকে উদ্‌বেগ (Anxiety) বলতে বোঝায় শরীরের ভেতরে হয়ে চলা একটা অস্বস্তি এবং যেটার কারণ কোনো অজানা বিষয় নিয়ে। যেমন কোনো অজানা জায়গায় কোনো অপরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে গেলে কারোর কারোর যে অনুভূতি হয়। তবে ভয় এবং উদ্‌বেগ দুটো বিষয়ই মানুষকে সতর্ক করে দেয় যাতে সে সামনে আসা বিপদ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে।

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ বা GAD শতকরা ৩ থেকে ৮ জন মানুষের হতে পারে। পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলাদের এই রোগ হয়।

কী কী উপসর্গ নিয়ে আসে?

এই রোগের মূল উপসর্গই হচ্ছে জীবনের সবক্ষেত্রে সব বিষয়ে অত্যধিক উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়া। মানুষটি সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, দেহের মধ্যে একটা ছটফটানি কাজ করে। বসে দাঁড়িয়ে শুয়ে কিছুতেই যেন শান্তি নেই। মাথা যন্ত্রণা, ঘাড় যন্ত্রণা হয়। মনোযোগের অভাব হয়। মাঝে মাঝে মাথা যেন শূন্য হয়ে যায়, কিছু মনে করতে পারে না। অল্পতে বিরক্তি চলে আসে। হঠাৎ হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে ওঠে।

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ এমনই একটা রোগ এর সঙ্গে শতকরা ৫০-৯০ ক্ষেত্রে আরও একটা মানসিক রোগ থাকে। যেমন আতঙ্ক রোগ বা Panic Disorder, সামাজিক আতঙ্ক রোগ বা Social Phobia অথবা অবসাদ রোগ বা Depression যুক্ত থাকে।

অনেকের বারবার প্রস্রাব পায়খানা হয়। হজমের সমস্যা হয়। ঘুমের অসুবিধা হয়। ঘুম কোনোরকমে এসে গেলেও বার বার ভেঙে যায়। সাধারণত এই রোগে আক্রান্ত মানুষ প্রথমে কোনো শরীরের উপসর্গ নিয়ে, যেমন ডায়রিয়া, শরীরের চিকিৎসকের কাছে যান। অনেক পরে মনোরোগের চিকিৎসকের কাছে আসেন।

সাথে আর কী কী রোগ থাকে?

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ এমনই একটা রোগ এর সঙ্গে শতকরা ৫০-৯০ ক্ষেত্রে আরও একটা মানসিক রোগ থাকে। যেমন আতঙ্ক রোগ বা Panic Disorder, সামাজিক আতঙ্ক রোগ বা Social Phobia অথবা অবসাদ রোগ বা Depression যুক্ত থাকে।

রোগের ভবিষ্যৎ

বেশির ভাগ রোগী বলেন তাঁদের উদ্‌বেগের উপসর্গ সেই ছোটোবেলা থেকে আরম্ভ হয়েছে। রোগটা যেকোনো বয়সেই শুরু হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পীড়াদায়ক কোনো ঘটনা থেকে উদ্‌বেগ রোগ শুরু হয়। এক-তৃতীয়াংশ রোগী সরাসরি মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে আসেন, বাকিরা জেনারেল ফিজিশিয়ান, কার্ডিয়োলজিস্ট থেকে গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট সবার কাছে যান। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সার্বিক উদ্‌বেগ রোগের সঙ্গে অন্যান্য মানসিক রোগ জড়িত থাকে তাই এই রোগের ভবিষ্যৎ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ গবেষণা বলছে এই রোগ দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই সারা জীবনব্যাপী থাকে।

চিকিৎসা

চিকিৎসা দু-ভাবে হয়। ১. ওষুধ দিয়ে এবং ২. মনশ্চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি (Psychotherapy)।

১. ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা: বেনজোডায়াজেপিন গ্রুপের ওষুধ ক্লোন্যাজিপাম, অ্যালপ্রাজোলাম দিয়ে চিকিৎসা হয়। এছাড়া ভেনলাফ্যাক্সিন এবং এসএসআরআই গ্রুপের ওষুধ সার্টালিন, এসসিটালোপ্রাম দিয়ে চিকিৎসা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট ওষুধ, যেমন অ্যামিট্রিপ্টিলিন, ইমিপ্রামিন ব্যবহার করা হয়।

২. মনশ্চিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি (Psychotherapy)

কগনিটিভ থেরাপি (Cognitive Therapy) এবং বিহেভিয়ারাল থেরাপি (Behavioral Therapy) সব থেকে কার্যকরী। প্রকৃতপক্ষে এই দু-টি একসঙ্গে অর্থাৎ 'কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি' প্রয়োগ করা হয়। কগনিটিভ বা অবগতি চিকিৎসা দ্বারা তার উদ্‌বেগকারী চিন্তাভাবনা দূর করা হয়। আর বিহেভিয়ার থেরাপিতে তার শারীরিক উপসর্গ দূর করা হয়। বিহেভিয়ার থেরাপির মধ্যে মাস্‌ল রিল্যাক্সেসান থেরাপি (Muscle Relaxation Therapy) এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ (Breathing Exercise) ভালো কাজ করে।

যেহেতু সার্বিক উদ্‌বেগ রোগ এমন একটা রোগ যেটা একটা

> বেশির ভাগ রোগী বলেন তাঁদের উদ্‌বেগের উপসর্গ সেই ছোটোবেলা থেকে আরম্ভ হয়েছে। রোগটা যেকোনো বয়সেই শুরু হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে পীড়াদায়ক কোনো ঘটনা থেকে উদ্‌বেগ রোগ শুরু হয়।

মানুষের কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয় তাই এই রোগ হলেই তার উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত। চিকিৎসাতে মানুষটি কার্যকরী জীবনযাপন করতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

Advt.

প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক কর্মজীবন সম্ভব

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

প্রতিবন্ধকতা, শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল অন্তরায় বা বাধা। এই অর্থ ধরে এগোতে গেলে বলতে হয় জীবনের পথে চলতে গিয়ে প্রত্যেকটা মানুষই প্রতিনিয়ত কোনো-না-কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং আপন আপন যোগ্যতাবলে সেই প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। সমাজের তথাকথিত প্রতিবন্ধীরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁদের প্রতিবন্ধকতাগুলি হয়তো আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের থেকে প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা আলাদা। যদিও তাঁরাও

ভারতের রাজধানী দিল্লির এক অভিজাত রেস্তোঁরার অন্দরের সাজসজ্জায় ব্যস্ত অমিতেশ। টেবিল সজ্জার ব্যাপারে অমিতেশ ভীষণ খুঁতখুঁতে। প্রতিটি ম্যাট যথাস্থানে থাকতে হবে। কাঁটাচামচ নিখুঁতভাবে সাজানো হতে হবে। অমিতেশের কাজের গতি কিছুটা শ্লথ কিন্তু ত্রুটিবিহীন।

জীবনযুদ্ধের সৈনিক হিসাবে আপন আপন যোগ্যতাবলে সেইসব প্রতিবন্ধকতাকে জয় করবার চেষ্টা করে থাকেন। এমন বহু উদাহরণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আমাদের চারপাশে। শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এঁদের অনেকেই সুস্থ সবল ও স্বাভাবিক মানুষদের তুলনায় বেশি সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়ে থাকেন এবং অনেকক্ষেত্রেই কঠিন পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যান সব বাধা জয় করে লক্ষ্যে পৌঁছোতে। কিন্তু এই যাত্রাটা কখনোই তাদের ক্ষেত্রে খুব সহজ হয় না। নিজস্ব প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বাধা, পারিপার্শ্বিক নেতিবাচক মনোভাব, অন্যের থেকে আলাদা হওয়ার অপরাধবোধ, পরিবারের হতাশা, এমনকী জন্মদাতা মা-বাবার অবসাদ তাঁদেরকে বারংবার চোখে আঙুল দিয়ে মনে করিয়ে দেয় এ সমাজের বুকে তারা অতিরিক্ত। মনে পড়ে যায় ভিক্টর হুগো-র লেখা উপন্যাস *দ্য হাঞ্চব্যাক অফ নতরেদাম*-এর প্রধান চরিত্র কোয়াসিমোদোর কথা। আরও পাঁচ শতক পেরিয়ে গেছে। কিন্তু অদ্ভুত দর্শন, বধির ও প্রায় অন্ধ কোয়াসিমোদোর যন্ত্রণা আজও আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক। কত না অত্যাচারের শিকার হতে হয় তাঁদের প্রতিনিয়ত। সমাজ বদলাচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নতি এইসব মানুষগুলোকে তাদের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে অনেকটাই সাহায্য করতে পেরেছে। শুধু বদলানো প্রয়োজন এঁদের প্রতি মনোভাব। আর সেই ব্যাপারে আলোকপাত করতেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

ভারতের রাজধানী দিল্লির এক অভিজাত রেস্তোঁরার অন্দরের সাজসজ্জায় ব্যস্ত অমিতেশ। টেবিল সজ্জার ব্যাপারে অমিতেশ ভীষণ খুঁতখুঁতে। প্রতিটি ম্যাট যথাস্থানে থাকতে হবে। কাঁটাচামচ নিখুঁতভাবে সাজানো হতে হবে। অমিতেশের কাজের গতি কিছুটা শ্লথ কিন্তু ত্রুটিবিহীন। যেকোনো 'স্বাভাবিক' মানুষের তুলনায় সে বেশি কর্মক্ষম ও দক্ষ। সে সপ্তাহে ৬ দিন ৯ ঘণ্টা করে কাজ করে। অমিতেশ ১৯৯০ সালে ডাউনস্ সিনড্রোম নিয়ে জন্মায়। অমিতেশের মা-বাবা উচ্চশিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হওয়ায় তাঁকে তাঁরা স্পেশাল স্কুলে পড়াশোনা ও বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন সে বড়ো হল স্বাভাবিকভাবেই ওঁরা চিন্তিত হলেন এরপর কী? কীভাবে অমিতেশ স্বনির্ভর হতে পারে সেই নিয়ে তাঁরা চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কোনো এক কাজের সূত্রে চেন্নাই গিয়ে যে হোটেলে ওঁরা ছিলেন সেখানে দু-জন মূক ও বধির হাউসকিপিং স্টাফদের দেখে ওঁরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। দিল্লিতে ফিরে গিয়েই যোগাযোগ করেন লেমন

ট্রি নামক সেই হোটেলে। সারা ভারতে তাদের বিভিন্ন শাখা আছে। সেখানে অমিতেশকে সুযোগ দেওয়া কাজের। লেমন ট্রি হোটেলের ২৪টি শহরে প্রায় ৪০টি হোটেল আছে। ৪০০০ কর্মচারী সেখানে নিযুক্ত যার প্রায় ২২% কর্মচারী কোনো-না-কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার—ডাউনস্ সিনড্রোম, অটিজিম্, মূক ও বধিরতা। লেমন ট্রি হোটেলের কর্তৃপক্ষ ভাবছেন ২০২৫ সালের মধ্যে সংখ্যাটা বাড়িয়ে ৪০% করা হবে। কারণ কী? এ কি শুধুই দয়াদাক্ষিণ্য? মোটেও ব্যাপারটা সেরকম নয়। এঁদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নেওয়া হয়েছে। কেন ? কী কী সুবিধা এই মানুষগুলোকে কর্মচারী হিসাবে পাওয়া গেলে?

১. এমন মানুষের জন্য কিছু করতে পারার যে ইতিবাচক ইঙ্গিত তা সমাজের অন্য মানুষকেও ছুঁয়ে যায়।

২. এই কারণেই অনেক গ্রাহক বারবার ফিরে আসেন এই হোটেলে।

৩. সচরাচর এমন মানুষগুলি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তরিক হন।

৪. এই মানুষগুলি যেহেতু অনেক সামাজিক পরিস্থিতিতে অমানবিক আচরণের সম্মুখীন হন বা উপেক্ষা সহ্য করেন তাই কাজ করতে পারলে তাঁরা গুরুত্ব পাওয়ার তাগিদে অনেক বেশি মনোযোগী কর্মচারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

মুম্বাই শহরের মির্চি অ্যান্ড মাইম নামের রেস্তোঁরাটিতেও ৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকজন মূক ও বধির। তাঁদেরও ভবিষ্যতে আরও কিছু করার ইচ্ছা আছে।

মুম্বাই শহরের মির্চি অ্যান্ড মাইম নামের রেস্তোঁরা-টিতেও ৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে প্রায় অর্ধেকজন মূক ও বধির। তাঁদেরও ভবিষ্যতে আরও কিছু করার ইচ্ছা আছে।

Aegis Ltd নামের বিপিও কোম্পানিও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। বিশ্বের নয়টি দেশে (ভারতে ত্রিশটি সংস্থায়) প্রায় ৪৫০০০ কর্মচারী কাজ করেন। তাদের মধ্যে ৬০০ জন প্রতিবন্ধকতার শিকার, যেমন—দৃষ্টিহীনতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি, মৃগী ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই এগিয়ে আসা আমাদের আশার আলো দেখায়। কিন্তু স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পার হয়ে গেলেও সরকারি খাতার হিসাব-নিকাশের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুব অল্পই পাওয়া যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এভাবে বাণিজ্যিক ও সামাজিক মনোভাব নিয়ে সমাজের অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু করতে পারেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই উদ্যোগ সরকারের তরফ থেকে না হলে ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে সমস্ত স্তরের প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা কি উপকৃত হতে পারবেন? শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যেখানে আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নিরন্তর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন সেখানে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার বোঝা নিয়ে এমন বিপুল প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন কি ওঁরা?

এ প্রশ্ন গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রের রক্ষক ক্ষমতাসীন সরকারের সম্মুখে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। শুধু নাম বদল নয়, প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের আশু প্রয়োজন আছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন সাইকোলজিস্ট।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

শ্রোণির সামনে ঝুঁকে প ড়া
বা অ্যান্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট—একটি অনালোচিত সমস্যা

ডা. অনিন্দিতা দাস

মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণী। আমাদের মেরুদণ্ডটি ঠিক দণ্ডের মতো নয়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই মেরুদণ্ডটি কয়েকটি বাঁকযুক্ত থাকে। মানুষের মেরুদণ্ডে ৭-টি গলার (সারভাইক্যাল) হাড়, ১২-টি বুকের (থোরাসিক) হাড়, এবং ৫-টি কোমরের (লাম্বার) হাড় আছে; এরকম প্রতিটি হাড়কে ভার্টিব্রা বলে। কোমরের ভার্টিব্রাগুলির তলায় একটা তিনকোণা হাড় আছে, আসলে সেটি কয়েকটি ভার্টিব্রা জুড়ে যাবার ফলে তৈরি হয়। তারও নীচে সবশেষে থাকে কক্সিস বা 'লেজের হাড়'। মানুষের লেজ নেই বটে, কিন্তু কক্সিস হল বিবর্তনের ফলে লুপ্ত হয়ে যাওয়া লেজের চিহ্ন।

সার্ভাইক্যাল ভার্টিব্রা বা কশেরুকা মানুষের ঘাড় গঠনে ভূমিকা নেয় এবং মেরুদণ্ডের এই অংশটিতে সামনের দিকে উত্তল প্রকৃতির বাঁক থাকে, ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে সার্ভাইকাল লর্ডোসিস বলে। থোরাসিক ভার্টিব্রা মানুষের পিঠের ওপর দিক (upper back) গঠনে ভূমিকা নেয়। সামনের দিক থেকে দেখলে মেরুদণ্ডের এই অংশটিতে অবতল প্রকৃতির বাঁক থাকে। লাম্বার ভার্টিব্রা মানুষের কোমর (lower back) গঠন করে। মেরুদণ্ডের এই অংশটিতে সামনের দিকে উত্তল প্রকৃতির বাঁক থাকে—ডাক্তারি পরিভাষায় একে লাম্বার লর্ডোসিস বলে। স্যাক্রাম ও কক্সিস মানুষের নিতম্ব গঠনে ভূমিকা নেয়। এবং মেরুদণ্ডের এই অংশটিতে অবতল প্রকৃতির বাঁক থাকে। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে মানুষের মেরুদণ্ডটি বেশ আঁকবাঁক যুক্তই।

মেরুদণ্ডের মূল কাজ হল দেহের উপরের অংশের ভারকে শ্রোণি বা পেলভিসের মাধ্যমে দেহের নীচের অংশে পাঠানো, এককথায় ভার সঞ্চালিত করা। 'পেলভিস' অর্থাৎ শ্রোণি মূলত দুটি নিতম্ব অস্থি (হিপ বোন), একটি স্যাক্রাম, একটি কক্সিস দিয়ে গঠিত। এই হাড়গুলো বেশ কিছু 'লিগামেন্ট' দিয়ে বাঁধা থাকে। লিগামেন্টগুলো হল অনেকটা দড়ির মতো, একটা হাড়ের সঙ্গে আর-একটা হাড়কে বেঁধে রাখার প্রত্যঙ্গ।

এই সংখ্যায় আমাদের আলোচ্য বিষয় অ্যান্টেরিয়র পেলভিক টিল্ট অর্থাৎ শ্রোণির সম্মুখ-চ্যুতি অথবা পেলভিসের সামনের দিকে হেলে পড়া ও তার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি।

মানুষের মেরুদণ্ড নিয়ে মোটামুটি যে ধারণা আমাদের হয়ে গেছে, তার ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারব কীভাবে পেলভিসের অতিরিক্ত সম্মুখ-চ্যুতি মানুষের মেরুদণ্ডের উপর কুপ্রভাব ফেলে এবং তার ফলে আমাদের কী কী দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক অসুবিধার শিকার হতে হয়।

স্বাভাবিক অবস্থাতেই মানুষের পেলভিস কিছুটা পিছনের থেকে সামনের দিকে হেলে থাকে অর্থাৎ কিছুটা সম্মুখ-চ্যুতি তার থাকে। স্বাভাবিক এই হেলে থাকাটা মাপলে দাঁড়ায় ৬ থেকে ১৩ ডিগ্রি পর্যন্ত।। সাধারণত ১৩ ডিগ্রি-র বেশি সম্মুখ-চ্যুতি-সম্পন্ন পেলভিসকে অস্বাভাবিক ধরা হয়।

পেলভিসের ঠিক ওপরে থাকে লাম্বার ভার্টিব্রাগুলি, সেগুলিও কিন্তু

স্বাভাবিক অ্যান্টেরিয়ার পেলভিক টিল্ট

একেবারে সরলরেখায় নেই। আমরা আগেই 'লাম্বার লর্ডোসিস' কথাটা দেখেছি। তার মানে লাম্বার ভার্টিব্রাগুলো যেভাবে একের ওপর একটা সাজানো, তাতে সামনে থেকে দেখলে মেরুদণ্ডের সেই অংশটি সামনের দিকে উত্তল দেখায়। পেলভিস অতিরিক্ত পরিমাণে সামনের দিকে হেলে থাকার সঙ্গে মেরুদণ্ডের লাম্বার ভার্টিব্রাগুলির বাঁকের একটি সরল সমানুপাতিক সম্পর্ক আছে। পেলভিসের সম্মুখ-চ্যুতি বাড়লে লাম্বার লর্ডোসিস অর্থাৎ উত্তল বাঁকটিও বাড়বে। ডাক্তারি ভাষায় বললে, লাম্বার হাইপার-লর্ডোসিস দেখা দেবে। প্রায়শই কোমর-ব্যথার কারণ সন্ধানে এক্স-রে করালেই আমরা এই লাম্বার ভার্টিব্রার হাইপার-লর্ডোসিস-কে অধিকাংশ রুগীদের ক্ষেত্রে চাক্ষুষ করে থাকি।

অত্যাধিক সম্মুখ-চ্যুতি-সম্পন্ন পেলভিসের কারণ কী?

বারবার কিছু নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে হাটাচলা বা দাঁড়ানোর ফলে পেলভিসের সামনে পিছনের গঠনগত বিন্যাসের পরিবর্তন হয়।

➢ তার মধ্যে খুবই চর্চিত একটি অভ্যাস হল সেলফি তোলার সময় দেহের পশ্চাৎভাগকে পিছনের দিকে হেলিয়ে পেট অর্থাৎ দেহের সম্মুখভাগকে সামনের দিকে এগিয়ে দাঁড়ানো যার ফলে কোমর সংলগ্ন

ইনস্টাগ্রাম বাট পিকচার

এলাকায় একটি স্পষ্ট ধনুকের মতো বাঁক তৈরি হয়, যা 'ইনস্টাগ্রাম বাট পিকচার' নামে পরিচিত। এবং স্বনামধন্য/ধন্যা থেকে অনামধন্য/ধন্যা অনেকেই এই ভঙ্গিতে সেলফি তুলে তৃপ্তি পেলেও তা পরবর্তীকালে সমস্যাজনক হতে পারে।

➢ আর এক উপায়ে পেলভিসের সম্মুখ-চ্যুতির আধিক্য ঘটে তা হল মেয়েদের হিল তোলা জুতোর ব্যবহার। লম্বা হোক কি খাটো হোক, হিল তোলা জুতো পরে হাঁটাকে সবসময়ই ফ্যাশনের দুনিয়ায় 'আহা মরি' একটি ব্যাপার হিসাবে দেখানো হয়েছে বারবার। আমাদের থাইয়ের সামনের দিকের পেশিসমূহকে একসঙ্গে হ্যামস্ট্রিং পেশি বলে। এই পেশিগুলো হিপ এক্সটেনসর নামে পরিচিত, ও আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কাজে খুব জরুরি। হিল তোলা জুতো পরা ও সামনে ঝুঁকে সেলফি তোলা, এরকম সমস্ত প্রক্রিয়াতেই হ্যামস্ট্রিং পেশিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে পেলভিসের সাধারণ সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এবং পেলভিস সামনের দিকে হেলে আসে। যে ৪টি পেশিগ্রুপের সাহায্যে পেলভিসের গাঠনিক বিন্যাস রক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেশিগ্রুপ হল এই হ্যামস্ট্রিং মাসল গ্রুপ।

প্রেগন্যান্সি/ওবেসিটি

➢ এছাড়া ওবেসিটি ও প্রেগন্যান্সির কারণেও অ্যান্টেরিয়র পেলভিক টিল্টের মাত্রা বাড়ে। ফলস্বরূপ হাইপারলর্ডোসিস হয়, যা পরে কোমর ব্যথার (lower back pain) সূত্রপাত ঘটায় বহুক্ষেত্রে।

কোমর ব্যথা (lower back pain) ছাড়া আর যে যে শারীরিক জটিলতাগুলির ঝুঁকি বাড়ে সেগুলি হল:

☞ হ্যামস্ট্রিং মাসল স্ট্রেন যা পায়ে টান ধরা বা ঝিনঝিনে ভাব দিয়ে অনুভূত হয়। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যার মাত্রা বাড়ে।

☞ ACL injury অর্থাৎ হাঁটুর অস্থিসন্ধির ACL লিগামেন্টের আঘাতের সম্ভাবনা বাড়ে। এর ফলে হাঁটু ফোলা ও ব্যথা দেখা দেয়। অনেকসময় শল্য চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়।

জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ফলে আজকের যুগে অনেক রোগ, ব্যাধির, শারীরিক সমস্যার প্রাচুর্য বেড়েছে। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জটিলতাগুলি থেকে মুক্তির উপায়ও কিন্তু এই জীবনযাত্রারই পরিবর্তন। কেবল মাত্র ওষুধ দিয়ে তা করা যাবে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা দাস, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

পর্ব পনেরো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপির অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বড়োকর্তার ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখি কালীচরণ হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছে। এসেই তার দেশের বুলিতে আমাকে যাচ্ছেতাই বকাঝকা শুরু করে দিল: ‘কোথায় গিয়েছিলে? তখন থেকে তোমাকে আমি গোরু-খোঁজা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়েছি। তোমার মতো এরকম উজবুক আমি আর একটা দেখিনি। আগে যদি জানতাম, এইরকমটা হবে তবে কক্ষনো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম না।’ আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণটি তার এই কথায় খুব রেগে গিয়ে বললেন: ‘তুমি কেমনধারা লোক হে বাপু? তুমি একটি মেয়েকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে বলে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। আর তাকে স্টেশনে একলা ফেলে রেখে তুমি দিব্যি চান-খাওয়া করতে চলে গেলে। আমরা যদি আশেপাশে না থাকতাম, তাহলে ও আজ যে কী বিপদে পড়ত, ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। আর এসবের পরেও তোমার এতবড়ো আস্পর্ধা যে ওকে তুমি মেজাজ দেখাও।’ কালীচরণ জবাব দিল: ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কেমন মেয়েমানুষ জানা আছে আমার। ও একাই সাতটা লোকের মহড়া নিতে পারে, তাদের প্রাণবায়ু ওষ্ঠাগত করে দিতে পারে। ওর আবার ভয় কীসের? দেখুন, আমি খুব ভালো করেই জানি, ও কেমনধারা মেয়ে।’ এই সময়ে একটি কুলি এসে আমার ব্যাগ আর কাঁসার থালাটা রেখে গেল। তার সঙ্গে এলেন বড়োকর্তা, বললেন: ‘এসব কথা তোমার জ্ঞাতিকে জানিও না।’ বলে চলে গেলেন।

এসব দেখে কালীচরণ একেবারে দপ করে জ্বলে উঠল, বলল: ‘দেখলেন, দেখলেন তো বামুনমশাই! কী জাঁহাবাজ মেয়ে ও?’ ব্রাহ্মণ বললেন: ‘তুমি পুববাংলার একটি অকালকুষ্মাণ্ড। কী হয়েছে কিছু না জেনেই আজেবাজে তড়পে যাচ্ছ। যদি জানতে, ও কোন পরিবারের মেয়ে তাহলে এসব আজেবাজে কথা বলার সাহস পেতে না। ও আমাদের মনিবের মেয়ে। সেজন্যেই ওকে যতটা পারি আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করছি।’ এসব কথা ওই গেঁয়োভূতটার কানেই ঢুকল না। আমি একটা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠলাম। ব্রাহ্মণকে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিলাম। একটি রেলওয়ে-কেরানি এসে আমার কামরার গায়ে একটা সাদা কাগজ সেঁটে দিল। তাতে লেখা ছিল: মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত। তখন কামরাগুলোতে গরাদ দেওয়া থাকত। গেঁয়োটা তার কামরায় উঠল না। গরাদের উলটোদিকে একটা বেঞ্চিতে বসে আপনমনে গজগজ করতে লাগল: ‘বেজম্মাটা আমাকে বলে কিনা

গেঁয়োভূত! কিন্তু নিজের চোখে কী দেখলাম? তুমি একটা ভদ্রঘরের মেয়ে, সায়েবসুবোর সঙ্গে তোমার অত গা-ঢলাঢলি কীসের বাপু? খুড়ো বলেছিলেন, তুমি নাকি ভালো মেয়ে, তাই। না হলে কক্ষনো তোমার মতো মেয়েছেলেকে সঙ্গে নিতাম না।' এইরকম বিচ্ছিরি কুৎসিত কথাবার্তা শোনার পর আমি আর থাকতে পারলাম না। কী হয়েছে না-হয়েছে, সব ওকে খুলে বললাম। এতক্ষণে ওর মুখ বন্ধ হল।

এমন সময়ে বছর চল্লিশেকের এক বাবু আর এক বৃদ্ধা আমার কামরার সামনে এসে ডাকতে লাগলেন: 'এই পানু, বেরিয়ে আয়; বেরোচ্ছিস না কেন?' আমি সোজা হয়ে বসে বললাম: 'আপনারা কাকে ডাকছেন?' দু-জনে মিলে আমাকে প্রায় ভেংচে উঠলেন: 'বটে! "আপনারা কাকে ডাকছেন?" তুই যেন জানিস না কাকে ডাকছি, ন্যাকা! তোকে ডাকছি, তোকে। আর কাকে ডাকতে যাব শুনি!' 'ভগবানের দোহাই, কী থেকে আপনারা ভাবলেন যে আমি পানু। আপনাদের কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে।' 'তা বটে! ভুল তো আমরাই করছি! তুই কী ভাবিস আমরা তোকে চিনি না? আগে বল, গয়নাগাটি কোথায় সরিয়েছিস?' 'কী উটকো ঝামেলা রে বাবা! এ লোকগুলো কারা? আর গয়নার কথাই বা আসছে কীসে? কী গয়না? ও কালীচরণ, এ লোকগুলো কী বলছে, শোনো তো।' কালীচরণ উঠে বসে জিগেস করল: 'আপনারা কী নিয়ে কথা বলছেন বলুন তো?' বৃদ্ধাটি বললেন: 'আমাদের মেয়েটিকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলি? বল।' কালীচরণ বলল: 'কে বলেছে এ আপনাদের মেয়ে?' বৃদ্ধাটি বললেন: 'কে আবার বলবে? আমি বলছি, আমি।' এবারে কালীচরণ খুব রেগে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকে ডাক দিল। স্টেশন মাস্টার এসে জিগেস করলেন: 'আপনারা কী চান?' বৃদ্ধা বললেন: 'এ মেয়েটি আমার নাতনি। এই বাঙাল-ভূতটা আমার নাতনিটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কিচ্ছু জানি না। তার ওপর ওরা কামরার দরজাটা বন্ধ করে রেখেছে। দয়া করে দরজাটা খোলার ব্যবস্থা করুন। দেখি, ওই বেজম্মা-বজ্জাত মেয়েটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে নামিয়ে আনতে পারি কিনা।' আমি বললাম: 'বাবু, আমি এঁদের কেউ হই না। এই কালীচরণ আমার ভাগনে আর রাজঘাটের স্টেশন মাস্টার আমার জ্ঞাতিভাই।' আমি তাঁকে আমার পাশ দেখালাম। কালীচরণও তাঁকে আমাদের আসল পরিচয় বুঝিয়ে বলল। বৃদ্ধা অবাক হয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন। বৃদ্ধার ছেলে, যাঁর মেয়ে পালিয়েছে, এবার কথা বলে উঠল: 'মা, এ আমাদের মেয়ে নয়। আমার মেয়েটা তো এই মেয়েটার থেকে ছোটো।' কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই দমবার পাত্রী নন, বললেন: 'দেখছিস না, ও গা থেকে গয়নাগাটি সব খুলে নিয়েছে! সেজন্যেই তো বয়েসটা বেশি লাগছে।' কিন্তু স্টেশন মাস্টার মাঝপথেই ওঁর কথা থামিয়ে দিলেন: 'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি? বয়েস হয়েছে তো! যান এখান থেকে। এই মেয়েটি রাজঘাট স্টেশন মাস্টারের জ্ঞাতিবোন।' একথা শোনার পরও বৃদ্ধা জেদাজেদি করতে লাগলেন: 'ও আমাদেরই ঘরের মেয়ে, ওর তো বরও আছে। এই বেজম্মাটা ওর গয়নাগাটি খুলে নিয়ে সিঁথের সিঁদুরও মুছিয়ে দিয়েছে। বলুন তো, এরকম জঘন্য ব্যাভার কি কারও প্রাণে সয়?'

হুইসল বাজিয়ে ট্রেন রওনা দিল। বৃদ্ধাটি এবার কান্নায় ভেঙে পড়ে হাহাকার করে উঠলেন: 'তুই কি ভেবেছিস এতে তোর ভালো হবে? এইভাবে তুই মা-বাবার মন ভেঙে দিবি? তোকে আমি তুলো তুলো করে পেলে-পুষে এতটা বড়ো করলাম; আর সেই তুই আমাকেই ছেড়ে চলে গেলি! কী মনে করেছিস, তুই সুখী হবি? কক্ষনো না। ট্রেনের

ওঁর জন্যে আমার খুব দুঃখ হল। যতক্ষণ ট্রেনটাকে দেখা যায় সেই দিকে বৃদ্ধাটি অপলক চেয়ে রইলেন। আমার বুকের ভেতর কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল।

পাশে পাশে ছুটতে ছুটতে তিনি কপাল চাপড়াচ্ছেন আর যেসব কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই, সেইসব কথা বলতে বলতে বিলাপ করে চলেছেন। ওঁর জন্যে আমার খুব দুঃখ হল। যতক্ষণ ট্রেনটাকে দেখা যায় সেই দিকে বৃদ্ধাটি অপলক চেয়ে রইলেন। আমার বুকের ভেতর কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠল। হে ভগবান, আমাকে নিয়ে কী খেলাই যে খেলছ তুমি! এদিকে আমি ভেসে চলেছি কোন অজানার উদ্দেশে, আশেপাশে উদ্ধার করার মতো কেউ নেই। আর একদিকে অন্য বাড়ির লোকজন তাঁদের মেয়েকে নিয়ে বিলাপ করছে, যে মেয়ে নাকি আমার মতো দেখতে। আর আমাকে নিয়ে দড়ি টানাটানি খেলারও কোনো বিরাম নেই। হে ভগবান! আর কত বিপাকে আমাকে ফেলবে তুমি? তোমার ভাঁড়ারে আমার জন্যে আর কত হেনস্থা জমা হয়ে আছে? কোন কুক্ষণে যে বেনারস ছেড়েছি, তা আমি নিজেই জানি না। তুমি আমাকে একটার পর একটা বিপদে ফেলেই চলেছ, সামনে আরও কত বিপদ যে অপেক্ষা করে আছে কে জানে! প্রভু! তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। এখন তো দেখছি, কোনোকিছুই আমার ঠিক নেই। কোথায় যাব, কী করব, কিছুই জানি না। দুর্গামোহন দাশ আর শাস্ত্রীমশাই যদি আমাকে আশ্রয় না দেন তাহলে কোথায় যে যাব, কী করব—কিছুই আমার মাথায় আসছে না।

কলকাতা

একরাশ দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ভারী মনে কলকাতায় পৌঁছোলাম। কালীচরণ আর আমি দু-জনেই নামলাম ট্রেন থেকে। ও আমাকে জিগেস করল: 'কোথায় যেতে চাও তুমি?' আমি ওকে চিঠি দুটো

দেখিয়ে বললাম: 'আমি কিন্তু রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না।' কালীচরণ চিঠির ওপর এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বলল: 'চৌরঙ্গি—সে তো অনেক দূর! আমি এখন অত দূর যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমি আমার সঙ্গেই এসো; আমি এখন রাহাদাদার বাড়ি যাচ্ছি।' আমি ঘাড় নাড়লাম; তাছাড়া আমার কীই-বা করার আছে!

আমরা গন্তব্যে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতে এক বৃদ্ধ ছুটতে ছুটতে এসে বললেন: 'ভালো আছ তো, স্বর্ণ?' আমি অবাক হলাম। ইনি কালীচরণকে স্বর্ণ বলছেন কেন? নাকি ওঁরা এইরকম ভাষাতেই কথা বলেন! কী হচ্ছে না হচ্ছে আমার চারপাশে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল যেন একটা স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়াচ্ছি। তারপর বাড়িতে ঢুকলাম। রাহাগিন্নি বাঙাল ভাষায় আমাকে বললেন: 'স্বর্ণর লগে আইছ তুমি?' আমি ঘাড় কাত করে সায় দিলাম। তিনি জিগেস করলেন: 'আর বনমালীর বউডায় আছে কেমুন?' এবার আমি এতটাই অবাক হয়েছি যে মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। তিনি বললেন: 'কী হইল, বোঝবার পার নাই বুঝি? আমি স্বর্ণর খুড়িমার

তারপর থেকে তিনি যা বলে যাচ্ছেন, বুঝি আর না বুঝি, তাতেই ঘাড় হেলিয়ে সায় দিতে থাকলাম। আমার এরকম ভাবসাব দেখে, রাহাগিন্নি মনে করলেন . . .

কথা কই।' বললাম: 'তিনি ভালো আছেন।' রাহাগিন্নি জিগেস করলেন: 'আর ওই নষ্টা কুলটা মাইয়ামানুষডা? হ্যায় কি অখনও বাঁইচ্যা আছে না মরছে?' আমি জিগেস করলাম: 'কোন নষ্টা মেয়েমানুষ? আপনি কি বনমালীর বড়ো বউয়ের কথা বলছেন?' 'হ, হ, তার কথাই কই। জান না তুমি, ওই ঢলানি মাগিডা একডা রক্ষিতা?'

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লাম। হে ভগবান! সবকিছুই কেমন রহস্যে মোড়া। এমনকী নামগুলোও সব উলটোপালটা। ঠিক করলাম, এর শেষ দেখে ছাড়ব। তারপর থেকে তিনি যা বলে যাচ্ছেন, বুঝি আর না বুঝি, তাতেই ঘাড় হেলিয়ে সায় দিতে থাকলাম। আমার এরকম ভাবসাব দেখে, রাহাগিন্নি মনে করলেন, আমি বুঝি ওদের সকলকেই ভালোভাবে চিনি, জানি। তিনি এমন অনেক কথা বলে যেতে লাগলেন, যার বিন্দুবিসর্গও আমার মাথায় ঢুকছিল না। রাহাদাদার রাঁধুনি বামুন ছিল। রাহাগিন্নি তড়িঘড়ি হেঁশেলে গিয়ে বললেন: 'ও অনাথ! মন দিয়া শোনো, স্বর্ণ আইছে, ভালো কইর‍্যা রাঁধবা। অর লগে একডা মাইয়াও আইছে, হ্যায়ও আমাগো লগে খাইবে। বোঝতেই তো পারো, ভালো কইর‍্যা না রাঁধতে পারলে তোমার আর রেহাই নাই।' রাঁধুনিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসে তিনি জিগেস করলেন: 'তুমি বামুন না শুদ্দুর?' জবাব দিলাম: 'আমি জাতে কায়স্থ।' 'তা হইলে তো তুমি আমাগো জাতের মদ্যেই পড়লা।' আমি বললাম: 'হ্যাঁ।' 'আমাগো হেঁশেলেই যদি তোমার পাক হয়, তা হইলে তোমার কোনো আপইত্ত নাই তো?'* আমি খানিক ভেবে নিয়ে বললাম: 'না, কোনো অসুবিধে নেই।'

এরপর রাহাগিন্নি জেরায় জেরায় আমাকে জেরবার করে ছাড়লেন: 'তোমাগো বাড়ি কোথায়? বেনারসে তোমার আত্মীয়-কুটুম কারা? অহন তুমি যাইবা কোথায়?' আমি তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিলাম। আমি কিছু জিগেস না করতেই তিনি নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন: 'দ্যাহ, এই স্বর্ণ আর তার বাড়ির লোকগুলা আমাগো খুবই নিজের জন। অর ঠাকমায় আমাগো যা ভালোবাসা দিত, যা যত্ন-আত্তি করত; দ্যাখলে মনে হইবে হ্যায় যেন সাক্ষাৎ আমাগো নিজের লোক। আমরা দুইডা পরিবার এমন মিশ খাইয়া গেছিলাম যে হ্যারগো মাথাতেই থাকত না যে অরা বামুন আর আমরা শুদ্দুর।** পোলাপানগুলা আমাগো লগে এমনভাবে ল্যাপটাইয়া থাকত, য্যান আমাগো বাড়িরই পোলাপান। আমার নিজের তো একটাও ছাওয়াল-মাইয়া নাই। এই অগো নিয়াই আমার দিন কাইট্যা যাইত। একডার পর একডারে পাইল্যা-পুইষ্যা বড়ো করছি। পেরথমে স্বর্ণ, তারপর তার বইন নলিনী আর রজনী। বিমলারে তো বাড়িত দ্যাখনই যাইত না। বনমালীর সঙ্গে যহন মামলা চলতে আছিল তহন স্বর্ণর বাবা মারা যায়। অগো ঠাকমা তহন পাগলির মতো এ-দোরে ও-দোরে মাথা কুইট্যা মরতাছে। আমি তহন বাড়িতই থাকতাম। আমার বরে তহন এক ছেনাল বেবুশ্যে মাগির লগে ঘর করত। আমি থাকতাম স্বর্ণর মায়ের লগে। বনমালীর বউডার তহন ভরা যৌবন।'

আমি জিগেস করলাম: 'বনমালী কীসের মামলায় জড়িয়েছে?' 'অঃ! তুমি শোনো নাই বুঝি? হেইডা তো একডা খুনের মামলা। বনমালী তহন থাকত বরিশালে। যেই বাড়িডায় থাকত, হেই বাড়ির বউডায় অরে খাবার দিয়া যাইত। বউডার স্বভাব-চরিত্তির ভালো নয়। জোয়ান ছোকরা বনমালী। বউডা হ্যার লগে একডা লডঘড বাধাইয়া বসল। কিছুদিন বাদে একডা লোক আইসা বরডারে খুন কইরা ফালাইল। হেইদিনই বউডা বনমালীরে লইয়া পলাইছে। তারপর পুলিশ আইসা এরে টানে, ওরে মারে—অ্যাক্কেরে হই হই রই রই কাণ্ড। বনমালী ঠাকমার একডাই পোলা। আর-এক পোলা নীলকমল চক্রবর্তী

*বিধবাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব কড়া বিধিনিষেধ ছিল। যে হেঁশেলে অথবা উনুনে/স্টোভে আমিষ রান্না হয় সেখানে ওদের খাবার রান্না হলে ওরা খেত না।

**এককালে কায়স্থদের জাতে শূদ্র বলে মনে করা হত। উনিশ শতকে অবশ্য এই ধারণাটি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

দুই বছর আগেই মারা গেছে। রাইখ্যা গেছে এক পাল পোলাপান। ঠাকমা খবর শুইন্যা শোকে অ্যাক্কেরে পাথর। বাইরইলেন পোলার তালাশে। শ্যাষম্যাশ বেনারসে গিয়া পোলারে খুইজ্যা পাইলেন। পোলার নাম বদলাইয়া দিয়া কডাদিন পোলা আর পোলার বউয়ের লগে থাকলেন। শ্যাষে ফের নাতি-নাতনিগো কাছে ফিইর‍্যা আইলেন।'

'হেরগো তো টাকাপয়সার অভাব নাই। এহনও হ্যায় রাজঘাটের স্টেশন মাস্টারের কাম করে। আমরা যহন গয়া বেনারস গেছিলাম হ্যায় আমাগো যা যত্ন-আত্তি খাতির করছে, তা দ্যাহনের মতো। ওই নষ্টা মাগিডা হ্যারে রান্না কইর‍্যা খাওয়াইত। সইত্য কথা বলতে কী বাড়িডায় সবকিছুই চালাইত ওই মাগিডা; হেই য্যান বাড়িডার কর্ত্রী। হ্যার বউডা তহনও খুবই কচি। কী কইর‍্যা অতিথিরে খাতির-যত্ন করতে হয় কিছুই জানে না।' আমি তাঁকে জিগেস করলাম: 'ছেলের নতুন নামটা কী?' রাহাগিন্নি বললেন: 'হেই নামডা আমি মুখে আনতে পারুম না, আমার ভাশুরের নামে নাম।* তুমি তারা না কী য্যান একডা কইলা?' বললাম: 'তারাপ্রসন্ন রায়।' 'হ, হ, হেই নামডাই। তয় হ্যায় রায় হইল কী কইর‍্যা? অরা তো আসলে চক্রবর্তী!' আমি বললাম: 'যে ছেলেটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, আমাকে বলা হয়েছে ওর নাম কালীচরণ রায়।' গিন্নি বললেন: 'হ, হ, তোমারে তো অরা ওই নামই কইবে। অরা যহন বাইরে যায় তহন ওই নামেই মাইনষের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে। ওই যে খুনের গোলমালডা হইল তারপর বারো-চোদ্দো বছর কাইট্যা গেছে। হ্যারা কেউ বাড়ি আইলেই পুলিশ আইসা খোঁজখবর লয়। বনমালী আর কোনোদিনই নিজের বাড়ি আইয়া থাকতে পারব না। হ্যার মা-ই নানাকিছু উপহারসামিগ্রী লইয়া হ্যাগো লগে দ্যাখা করতে যায়। ফিরাও আসে একরাশ উপহার লইয়া। আইতে-যাইতে হ্যায় আমাগো বাড়ি এক চক্কর ঘুইর‍্যা যায়, তহন কত কী যে আমাগো হাতে তুইল্যা দেয়।'

কত কী যে তিনি একনাগাড়ে বলে গিয়েছিলেন তার কিছুই আমার এখন মনে নেই। কালীচরণের পরিবারের এই অবিশ্বাস্য অতীত কাহিনি

মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা, মনে সদাই উদ্‌বেগ। কোথাও যদি ঠাঁই না মেলে, তাহলে কী হবে? তখন কী করব তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। তারাপ্রসন্ন এমন নম্র ভদ্র শান্ত মানুষ। তাঁর পক্ষে কি কাউকে খুন করা সম্ভব? আমার মনে হয় ওঁর 'বড়ো বউটাই' এইরকম নৃশংস কাণ্ড ঘটানোর পাণ্ডা। দেখতে যা—রাক্ষুসী একটা! যে মানুষটার মনে এত দয়ামায়া, এত দরদ সে কখনো খুন করতে পারে না। চুপচাপ বসে এইসব কথাই ভাবছিলাম। রাহাগিন্নি আমাকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন: 'দেইখো! স্বর্ণ আর অন্য কেউ য্যান ঘুণাক্ষরেও এইসব ট্যার না পায়। কাউরে তুমি মুখ ফুইট্যা একডা কথাও কইবা না।' বললাম: 'না, না, আমি কেন এইসব কথা পাঁচকান করতে যাব?'

রাহাগিন্নি আমার হাতে চুলে মাখা তেলের শিশি দিয়ে চান করে আসতে বললেন, কেননা কলের জল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ-কথা শুনে আমি চট করে চান করতে চলে গেলাম। আমার জানা ছিল না কলের জল একটা নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। চানের পর তিনি আমাকে মুড়ি, নারকেল নাড়ু আর গঙ্গাজলি (মিহি করে গুঁড়ো করা নারকেল আর চিনি দিয়ে তৈরি মিষ্টি) খেতে দিলেন। খুব খিদে পেয়েছিল, এই খাবারটা পেয়ে আমি যেন প্রাণে বাঁচলাম। ভগবানের নাম নিয়ে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুতে না শুতেই ঘুম।

মাথায় একরাশ দুশ্চিন্তা, মনে সদাই উদ্‌বেগ। কোথাও যদি ঠাঁই না মেলে, তাহলে কী হবে? তখন কী করব তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কপালে যা লেখা আছে তা তো মেনে নিতেই হবে। আচ্ছা, আমি বেনারস ছাড়লাম কেন? সেখানে তো দিব্যি সুখে আরামে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমাকে কি বিছেয় হুল ফোটাচ্ছিল যে অমন জায়গা ছেড়ে আসতে গেলাম! আবার এ-কথাও ভাবছিলাম: 'বেনারসের শিব আমার মাথায় থাকুন; ওখানে কি মানুষ টিকতে পারে? রাজ্যের গুণ্ডা-বদমাসদের কি বেনারসে এসেই ঘাঁটি গেঁড়ে বসতে হয়? তবে না, বেনারসে তো পিসেমশাইয়ের মতো অমন ভালোমানুষও আছেন। আছেন খুড়িমা, বাড়ির মালকিন, মোক্ষদাদিদি, ভুবনদিদি, জয় মিত্রর বাড়ির কচি বউটি—এঁরা সকলেই ভারী ভালোমানুষ। কিন্তু অতশত কি আমি জানি? কে ভালো, কে মন্দ, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিই বা কেন? আমি একটা ছটফটে দুরন্ত নারী; আর এই ছটফটানিটাই আজ আমার এই হাল করে ছেড়েছে। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-কুটুম কেউ কি ছিল না? এ-কথা ঠিক, আমার বর নেই কিন্তু অন্যেরা তো ছিলেন। তাঁরা আমাকে স্নেহপরবশ হয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কপাল আমার! ছোট্ট ভাই আর বোনটা যে কী কষ্ট পাচ্ছে, কীভাবে দিন গুজরান করছে তার কিছুই আমি জানি না। কেউ কি ওদের দেখভাল করে? খিদে পেলে একমুঠি ভাতও তো জোটে না। আমি কেন ওদের কাছে ফিরে যাচ্ছি না? কিন্তু আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে যেন বলে উঠল: 'ওরে হতভাগী! যাবি কার কাছে তুই? কে তোকে দেখবে, ভালোবাসবে, মায়াममতায় জড়িয়ে নেবে? ওই ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের বাড়িতে কে আছে তোর?' না, না, কক্ষনো না। যা থাকে কপালে তাই হোক।

কথায় আছে: 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' নিজেই

*সেকালে কোনো নারীর স্বামীর বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ-আত্মীয়ের নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

জানি না কোথায় যাব, ঠাঁই পাব কি পাব না আর আমি ভেবে মরছি ছোটো ভাইবোনের কী হবে? এই নিষ্ফলা ভাবনায় কী লাভ? এইরকমভাবে আমি নিজেকে স্তোক দিতে থাকলাম। না চাইতেই রাহাগিন্নির থেকে যেসব খবরাখবর আমি পেয়েছি তা থেকে কালীচরণের পরিবারের এখনকার পরিস্থিতির খুঁটিনাটি সবকিছুই আমি পরিষ্কার

এই ছটফটানিটাই আজ আমার এই হাল করে ছেড়েছে। আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-কুটুম কেউ কি ছিল না? এ-কথা ঠিক, আমার বর নেই কিন্তু অন্যেরা তো ছিলেন।

জেনে ফেলেছি। এতে আমার উদ্‌বেগ দুশ্চিন্তা ভয়ানক রকমের বেড়ে গেল। ভগবান জানেন, শেষমেষ আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কী যে ঘটতে পারে, আর কীই-বা ঘটবে—কিছুই আমি জানি না। শেষপর্যন্ত একমাত্র ঈশ্বরই আমার সহায়। বিকেলে কালীচরণের সঙ্গে দেখা হতে জিগেস করলাম: 'কী, তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে না?' ও বলল: 'কাল সকালে নিয়ে যাব।' উদ্‌বেগে দুশ্চিন্তায় আমি কেমন ছটফট করছিলাম। ছটফটানি একটু জুড়োত যদি অন্তত জানতে পারতাম আমার জন্যে আগামীতে কোনো বন্দোবস্ত পাকা হয়েছে কী না। নিজেকে স্তোক দিলাম এই ভেবে—একটা তো মাত্র রাত, কেটে যাবে কোনোমতে। সে রাতটা রাহাদের বাড়িতে কাটালাম। পরদিন সকালে কালীচরণ একটা ভাঙাচোরা ছ্যাকরা গাড়ি নিয়ে এল। আমাকে নিয়ে দুর্গামোহন দাশের বাড়ির দিকে রওনা দিল। অনেকটা সময় লাগল

. . . ওই নষ্টা মাগিডা হ্যারে রান্না কইর‍্যা খাওয়াইত। সইত্য কথা বলতে কী বাড়িডায় সবকিছুই চালাইত ওই মাগিডা; হেই য্যান বাড়িডার কর্ত্রী।

দুর্গামোহন দাশের বাড়ি পৌঁছোতে। বাড়ির বাইরে সার সার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়ানো। বাড়িটাও বিশাল। বিলিতি পোশাক-পরা লোকজন আর চমৎকার পোশাকে সুসজ্জিতা মহিলারা সেই বাড়িতে ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন—আমি গালে হাত দিয়ে দেখছিলাম। গাড়ি থেকে নিজেকে কোনোমতে টেনে-হিঁচড়ে বার করে সীতানাথ রায়ের চিঠিটা ভয়ে ভয়ে এক আর্দালির হাতে ধরিয়ে দিলাম। বললাম: 'চিঠিটা সরাসরি তোমার মনিবের হাতে দেবে। আমি তোমায় বকশিশ দেব। যাঁকে লেখা তাঁর হাতেই চিঠিটা পৌঁছোল। তিনি খবর পাঠালেন, আমাকে কিছুক্ষণ বসতে হবে। (চলবে)। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক অভিধানকার ও প্রাবন্ধিক।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অমৃতস্যপুত্রাঃ

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত

আমি বেজায় রকমের দুর্মুখ। আমি চূড়ান্ত রকমের ঠোঁটকাটা। অন্তত সেরকমটাই সব্বাই মিলে বলে আসছে আর কি ! এবং বলে আসছে সেই ছোট্টবেলা থেকেই।

আমার বেশ মনে আছে একটা দিনের কথা . . . যেই দিন, আমার জন্মদাতা বাবা পর্যন্ত রীতিমতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন আমার ঢ্যাঁটামিতে। আমি তখন বেজায় ছোটো। পড়ি, ক্লাস থ্রি কিম্বা ফোর-এ। সেজকাকারা এসেছিলেন আমাদের পুরুলিয়ার কোয়ার্টারে। সেজকাকা আর সেজকাকি। খাওয়ার টেবিলে আড্ডা হচ্ছিল সক্কলে মিলে। আমাদের খাওয়া যখন প্রায় শেষের পথে, কাকিমা আর মা, থালা নিয়ে এসে বসলেন টেবিলে। আড্ডা ঘনীভূত হল আরও। আমি তখন—কুঁচো চিংড়ি। এসব আড্ডায় তখন, আমার প্রবেশ ছিল নিষেধ। টুঁ শব্দটি করার কোনো জো ছিল না। আমি তাই চুপটি করে বসে, ভাতের থালায় কাগের ঠ্যাং আর বগের লেজ আঁকছিলাম ইকিড়মিকিড়। হঠাৎ করেই, একটা লাইন চলে এল কানে—'মা বাপের চেয়ে বড়ো সম্পর্ক আর কিছু হয় না।' তিড়িং খটাস করে লাফিয়ে উঠলাম আমি। অনুমতির কাঁটাতার উপেক্ষা করে হইহই শব্দে বলে উঠলাম—'না না না, বাপ মায়ের চেয়েও বড়ো সম্পর্ক হয় তো . . . ' বাবার খাওয়া থেমে গেল। একমুহূর্ত থমথমানি কাটিয়ে, মা চটজলদি—'তোমায় আরেকটু তরকারি দেব? . . . এই পার্থ, যা হাত ধুয়ে শুবি যা . . . ' কিন্তু আমি তো ঠ্যাঁটা । উৎফুল্ল মুখে লাফিয়ে লাফিয়ে বলেই চললাম—'আরে আমি জানি . . . আমি . . . আমি . . . বইতে পড়েছি . . . ' এইবার ঘরে বাজ পড়ল। বাবা—'য্যাওওও . . . বড়োদের মাঝখানে কথা বলবে না একদম . . . যাওওওওও।' আমি থতমত হয়ে, মুখ নীচু করে, চেয়ার ছেড়ে, কুলকুচিয়ে, শোবার ঘরে এলাম। এই ঘরেরই একটা দেওয়াল-তাকে রয়েছে আমার যাবতীয় গুপ্তধন। তার মধ্যে থেকে টেনে বের করলাম—জাতকের গল্প। আর তারপর হুড়মুড়িয়ে, নির্দিষ্ট একখানি পাতা খুলে, বাবার সামনে গিয়ে বললাম—'তোমরা সবাই ভুল জানো . . . এই যে . . . এইখানে দ্যাখো . . . লেখা আছে—সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক হল বন্ধুত্ব।' বাবা গনগনে মুখে, আরও খানিক জ্বালানি যুক্ত হয়েছিল। আর সেজকাকা, ঠোঁটে "চুকচুক" শব্দ করে, মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'তোমার বাপের ঘরে, এই ছিলাটার জন্মের পর, মুখে মধু দ্যায় নাই বউদি?'

এই একই ঘটনা শুনেছিলাম, আরও একবার ছাতনাতে। ছাতনা, আমার দেশের বাড়ি। পুজোর দিনগুলোতে, সেখানে জড়ো হতাম সব্বাই। মস্ত দালানে সার বেঁধে পাত পেড়ে খাওয়া।

আর আমাদের সারির ঠিক উলটোদিকটাতে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা—ঠাকুমা। ঠাকুমা বসতেন ছোঁয়াছুৎ বাঁচিয়ে। আমরা খেতাম—ভাত ডাল কুমড়োর তরকারি আলু-ঝিঙে-পোস্ত আর

সেজকাকা, ঠোঁটে "চুকচুক" শব্দ করে, মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—'তোমার বাপের ঘরে, এই ছিলাটার জন্মের পর, মুখে মধু দ্যায় নাই বউদি?'

চালতার টক। ঠাকুমা খেতেন, মোটা সরের দুধে ডুবিয়ে পাতলা রুটি। একটা ছোট্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি থাকত এককোণে। তাতে চলত রাত্রি ন-টার হিন্দি সমাচার। খেতে খেতে আড়চোখে খবর দেখত সব্বাই।

সেইদিনও, তাই-ই চলছিল। খবর, খাওয়া, খোশমেজাজ। হঠাৎ, চোনা পড়ল।

খবরে দ্যাখানো পিরামিড দেখে, বড়োকাকা যেই বলে উঠলেন—'পিরামিডের ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে বেশ হত . . .।' ওমনি আমি, কেলাস ফাইভের পুঁচকে বাচ্চা, ঠিক বড়োদের মতো গম্ভীর স্বরে, বলে ফেললাম—'পিরামিডের ভিতরে বলে কিছু হয় না বড়ো কাকা . . . কথাটা হবে, পিরামিডের নীচে . . . মিশর রহস্য পড়নি বোধ হয়

এমবিবিএস-এ, আমাদের যে ন্যূনতম জ্ঞানটুকু দেওয়া হত, সেটা কাজে লাগিয়েছি প্রায় সবটুকুই। এবং সেই থেকেই বলতে পারি—'ভাগ্যিস . . . জন্মের পরে আমার মুখে মধু দেওয়া হয়নি . . .

. . . ' ঠাকুমা, সরমাখা রুটি থপাস করে থালায় ফেলে হেঁকেছিলেন—'বউউমাআআ . . . তোমাদের বারোনপুরে, জন্মের পর মুখে মধু দ্যায় নাই?'

তারপর ধীরে ধীরে, একটা সময়, সত্যিকারের বড়ো হয়ে উঠলাম আমি। পশ্চিমবঙ্গের সেরা মেডিক্যাল কলেজে এক্কেবারে প্রথম সারিতে গৃহীত হল আমার নাম। এবং পাঁচ বছর ধরে, আকাশ পাতাল পড়াশুনা করে, আমি রূপান্তরিত হলাম—ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এম.বি.বি.এস (ক্যাল)-এ। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন আমার নেই।

এম.ডি, এম.এস, আমি করিনি। আজ্ঞে হ্যাঁ, 'করিনি'। পরীক্ষাই দিইনি।

কিন্তু এমবিবিএস-এ , আমাদের যে ন্যূনতম জ্ঞানটুকু দেওয়া হত, সেটা কাজে লাগিয়েছি প্রায় সবটুকুই। এবং সেই থেকেই বলতে পারি—'ভাগ্যিস . . . জন্মের পরে আমার মুখে মধু দেওয়া হয়নি . . . ভাগ্যিস . . . এই ধরিত্রী-জীবনে আমার প্রথম খাদ্য ছিল—মাতৃসুধা, ভাগ্যিস . . . আমি 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

আমি পাশ করেছি বছর দশেক আগে। আমি, ঝাঁ চকচকে তো দূর অস্ত, হেঁপো ধুঁকধুঁকে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস পর্যন্ত করি না। এবং নেই আমার কোনো বড়ো ডিগ্রি।

তাই, মাসখানেক আগে, যেদিন আমার এক নিকট আত্মীয়ার বাচ্চা হল, যেদিন শুনলাম, তার বাচ্চাটি 'অ্যাবসোলিউটলি হেলদি বর্ন বেবি' এবং আত্মীয়াটির ডেলিভারির পরে দিব্যি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, সে বেচারি, বাচ্চাকে বুকে পেয়েছে, পাক্কা পাঁচটি ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পর, বুকে পেয়েছে, বাচ্চাটি 'কৃত্রিম খাদ্য' খাওয়ার পর, তখন বেশ কিছুটা ঘেঁটে গেলাম।

'এখন কি তার মানে গাইড লাইন পালটে গেছে?'

'এখন কি তার মানে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং আর নেই?' জবাব খুঁজতে ঝাঁপ মারলাম, প্রসূতিবিদ্যার বইয়ের নবতম সংস্করণে। ঠকঠকালাম—ইন্টারনেট। এবং, খোঁজ নিলাম, আরও বেশ কিছু আত্মীয়/ আত্মীয়ার "বেবি ডেলিভারি দাস্তান"-এর। স্তম্ভিত হলাম। গাইডলাইন পালটায়নি মোটেও। আমি, ভুল জানি না মোটেও।

কিন্তু, আমার খোঁজ নেওয়া চারজন আত্মীয়ার মধ্যে একজনও জানেন না এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং কাকে বলে। জানেন না, কেন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং শুধু জরুরিই নয়, অবশ্যপালনীয় কর্তব্যও বটে।

আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমাকে মুখর হতে হবে। আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমাকে কলম ধরতে হবে। তাই ধরলাম। যদি কোনো হিপোক্রিট থেকে থাকেন, যাঁদের 'স্তন' 'দুধ দোয়া' 'নিপল' এসব শব্দে, আপত্তি থেকে থাকে, তবে তাঁরা, প্লিজ, এরপর থেকে, লেখাটি আর পড়বেন না।

মাতৃদুগ্ধ। এই বকওয়াস রাম আর রহিমের লাঠি হাতে মারামারির দুনিয়ায় প্রাপ্ত একমাত্র অমৃত। যা তৈরি হয়, কেবলমাত্র নবজাতকের নিমিত্ত। যা তৈরি হয়, কেবলমাত্র, ক্রমশ পরিবর্তিত, নবজাতকের চাহিদা মাফিক।

ওক্কে বস, অনেক সাধুভাষা-টাসা কপচানো হল, এইবারেতে একটু 'অং বং চং' পপুলার জ্ঞান মারানো যাক। এক্কেরে প্রথমে, মায়ের বুক

তথ্য বলছে, যেসব বাচ্চা জন্মের পর প্রথম ছয় মাস মাতৃদুগ্ধর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরও কিছু খায়, সেইসব বাচ্চার, পেটের রোগ বা কানের ব্যথা বা অ্যাস্থমা বা জীবনঘাতী ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

থেকে যে তরলটি নিঃসৃত হয়, তার নাম—কলোস্ট্রাম। কলোস্ট্রাম ঝরে পড়তে থাকে, মোটামুটিভাবে, ডেলিভারির দুইদিন পর পর্যন্ত। এবং এই কলোস্ট্রাম নামক তরলটিতে থাকে:

ঐশ্বরিক কবচ-কুণ্ডল। একজন জননী, তাঁর চারপাশের ব্যাকটিরিয়া ভাইরাসের সঙ্গে, অদ্যাবধি লড়াই করে করে, যে ইমিউনিটি গড়ে তোলেন, কলোস্ট্রামের মাধ্যমে, ঠিক সেটাকেই তিনি উত্তরাধিকারে দেন, তাঁর আত্মজ/আত্মজা-কে। এ দুধে গোপনে লুকানো থাকে, সংক্রমণ ঠেকিয়ে রাখার চাবিকাঠি। আর কী থাকে? থাকে, বেজায় পরিমাণে ফ্যাট এবং প্রোটিন। থাকে ভিটামিন (মূলত ভিটামিন-A), এবং পটাশিয়াম। যা শিশুকে শুধু পুষ্টিই জোগায় না, বাস্তব জগতে,

প্রথমবার "প্যাঁঅ্যাঁ . . . ফড়াত" করে হাগু করতেও সাহায্য করে। দিন দুই পেরোলে পরে, মার্কেটে নামে অন্তর্বর্তীকালীন মাতৃদুগ্ধ। ফ্যাট বেশি। ক্যালোরি তুমুল। ঢপের চপ ন্যান সেরেল্যাক-এর থেকে লক্ষ কোটি গুণে, "বাঢ়তে বাচ্চো কে লিয়ে, সহি পোষণ"। বাংগালিমে বোলে তো—

"বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য সঠিক পুষ্টি"। তারপর এইভাবেই চলে, সপ্তাহ দুয়েক।

অ্যাই, এই-ব্বারেতে আগমন ম্যাচিওর 'দুদু'-র। কার্বোহাইড্রেট বাড়তে থাকে একটু একটু করে। সঙ্গে তৃষ্ণানিবারক জলীয় পদার্থ। সারাটা দিনে একজন মা, মোটামুটি 750 মিলিলিটার দুধ উৎপন্ন করেন। প্রতি একশো মিলিলিটার দুধে, 65 ক্যালোরি।

ভগবানের কোম্পানির এখানেই শেষ নয়। গ্রাহক, থুড়ি, সদ্যোজাতের কথা মাথায় রেখে, ঐশ্বরিক কোম্পানির তরফ থেকে দেওয়া হয় স্পেশাল অফার। বাচ্চা, যখন মায়ের বুকের দুধ চুষতে শুরু করে, তখন প্রথম কিছুক্ষণ বেরোয়, কেবলই জলীয় উপাদান। যে উপাদান, প্রথমে শিশুর তৃষ্ণা মেটায়। তারপর বেরোয়—খাবার . . . বেরোয় ক্যালোরি ভরপুর দুধ।

কী বুঝলেন? মাতৃদুগ্ধ, একাই একশো। মাতৃদুগ্ধ একাধারে রজনীকান্ত অন্য দিকে রাখী গুলজার। রজনীর মতো, শত্রু ব্যাকটিরিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে শিশুকে, রাখী গুলজারের মতো খাদ্য জোগায় সন্তান মুখে। তাই, তাই, তাই, আজ্ঞে না, মামা বাড়ি যাই নয়, তাই, জন্মের পর প্রথম ছয় মাস, আবার বলছি, জন্মের পর, প্রথম ছয় মাস, শিশুকে, আর কিছুই খাওয়ানো উচিত নয়। না—"কৃত্রিম খাদ্য বা ফর্মুলা ফিড", না—জল।

তথ্য বলছে, যেসব বাচ্চা জন্মের পর প্রথম ছয় মাস মাতৃদুগ্ধর সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরও কিছু খায়, সেইসব বাচ্চার, পেটের রোগ বা কানের ব্যথা বা অ্যাস্থমা বা জীবনঘাতী ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তথ্য বলছে, যে সমস্ত জননী, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান না, তাঁদের বুকে বা জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগ্যানাইজেশন বা WHO, বিস্তর গবেষণার পরে সঠিক রূপে, সদ্যোজাত পালনের কতগুলি মানদণ্ড ঠিক করেছেন। যে যে হাসপাতাল, সেগুলি মেনে চলে, সেগুলিকে বলা হয়—"বেবি ফ্রেন্ডলি হসপিটালস"।

প্রাইভেট নার্সিংহোমের কথা জানিনে, কিন্তু আমি নিজে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করেছি, আমি নিজে, বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কাজ করেছি, তাই জানি, আপাত পাশবিক সরকারি হাসপাতালগুলিতে, এই বেবি ফ্রেন্ডলি প্র্যাকটিস মেনে চলা হয় অনেকটাই। প্রতিনিয়ত, সরকারি হাসপাতালগুলিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রাখেন—কড়া নজরদারিতে। দু-একটা ব্যতিক্রম হতেই পারে, কিন্তু মোটের ওপর, নিয়ম মেনে চলে, প্রতিটি সরকারি হাসপাতালই।

তা কী বলছে সেই "বেবি ফ্রেন্ডলি হসপিটাল ইনিশিয়েটিভ" বা BFHI ?

বলছে,

- ডেলিভারির (নর্ম্যাল হোক বা সিজার) পর, ম্যাক্সিমাম এক ঘণ্টার মধ্যে, সদ্যোজাতকে, মায়ের কাছে দিতে হবে। মায়ের যদি সিজার হয়, তবে মা, ব্যথাজনিত এবং অপারেশন-জনিত দুর্বলতায়, শিশুকে ক্রোড়ে নেওয়ার মানসিক জোর হারিয়েই ফেলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে, বুঝিয়েসুঝিয়ে, মায়ের মানসিক জোর ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব—কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীর (ডাক্তার নার্স প্রমুখ)।
- এরপর থেকে, মায়ের সঙ্গে শিশু থাকবে, চব্বিশটি ঘণ্টা এবং প্রতিটি দিন। এতে, মা-শিশুর যোগসূত্র বেড়ে উঠবে। শিশু, উষ্ণতা খুঁজে পাবে, মায়ের কোলে।
- মাতৃদুগ্ধের পূর্বে, শিশুর মুখে, কিচ্ছুটি দেওয়া যাবে না। এবং প্রথম ছ-মাস, শিশু যাতে শুধু এবং শুধুইমাত্র মাতৃদুগ্ধ খায়, সে বিষয়ে, জননীকে সচেতন করতে হবে। (এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং-এর কাউন্সেলিং করা, চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য)
- জননীকে শেখাতে হবে, ঠিক কী পদ্ধতিতে, বুকের দুধ খাওয়াতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ—'এই বাচ্চাকে ডান বুকে দুধ খাওয়াচ্ছি, হঠাৎ ইচ্ছে মতো বাঁ স্তন, মুখে গুঁজে দিলাম'—এটি অনুচিত।

কেন অনুচিত?

কারণ, ওইইই যে বললাম, দুধের প্রথম অংশ তৃষ্ণানিবারক। পরের অংশ ক্ষুধা নিবারক। ডান বুক থেকে হঠাৎ করে বাম বুকে নিয়ে চলে গেলে, এরকমটাও হতে পারে, যে, দু-টি স্তনেই, শিশু, শুধু জলীয় অংশই খেতে পেল। তাই, ততক্ষণ পর্যন্ত বুক পালটানো উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না, শিশু নিজেই ছটফট করতে শুরু করে।

ছটফটানির অর্থ—'এই বুকের দুধ আপাতত শেষ . . . হাম অউর পিয়েঙ্গে'।

(মনে রাখবেন, এই সবকয়টিই প্রযোজ্য হেলদি বেবি, এবং হেলদি মাদারদের ক্ষেত্রে। বাচ্চা বা মা, যদি অসুস্থ থাকে, চিকিৎসক চাইলে এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটাতেই পারেন)

লেখাটা এখানেই শেষ করতে পারতাম। বড়ো হচ্ছে বেজায়, কেউ পড়বার উৎসাহ পাবে না আরও যদি বড়ো করি, জেনেও, একটি পয়েন্ট, না তুলে পারছি না। ফিডিং বোতলে, যখন কোনো বাচ্চা খাবার খায়, তখন, তাকে শুধুমাত্র, বোতলের টিট বা বোঁটাতে চাপ দিতে হয়। বুকের দুধ খাওয়ার টেকনিক কিন্তু ভিন্ন। সেখানে, একই সঙ্গে, চাপ দিতে হয়, এবং চুষতেও হয়। তাই, যে বাচ্চা, জন্মের পর,

কৃত্রিম খাবার ফিডিং বোতলে খেতে অভ্যস্ত, সেই বাচ্চা সহজে, মায়ের বুকের দুধ খেতে চায় না।

বলা ভালো—খেতে পারে না। এবং শুনলে অবাকই হবেন হয়তো, এই "টানা এবং চোষা", শিশুর দাঁত এবং চোয়ালের গঠনে সাহায্য করে।

হা হা হা হা, আজ্ঞে নাঃ, আপনাদের পোড়া কপালে আরও বেশ খানিক ধকধকানো আগুন জ্বালিয়ে, লেখাটা, শেষ করছি না এখানেও। এবং শেষ করছি না, এ যুগের কথা ভেবে।

এখন, অজস্র মা-জননী রয়েছেন, যাঁরা অফিস-কাছারিতে, কর্মরত। তাঁরা যদি প্রথম ছয় মাস "ম্যাটারনিটি লিভ" না পেয়ে থাকেন, তবে, প্লিজ় দিদি, এক্সপ্রেসড ব্রেস্ট মিল্ক-এর সাহায্য নিন। সোজা ভাষায়, বুকের দুধ দুয়ে, বাড়িতে ফ্রিজে রেখে আসুন। আপনার অবর্তমানে, বাচ্চা, সেই দুধ বোতলে করে খাবে। নিয়ম অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে একটি কক্ষ থাকা উচিত, যেখানে, একটি ফাঁকা ঘরে, একখানি ফ্রিজ থাকবে।

মাতৃদুগ্ধের পূর্বে, শিশুর মুখে, কিচ্ছুটি দেওয়া যাবে না। এবং প্রথম ছ-মাস, শিশু যাতে শুধু এবং শুধুইমাত্র মাতৃদুগ্ধ খায়, সে বিষয়ে, জননীকে সচেতন করতে হবে। (এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং-এর কাউন্সেলিং করা, চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য)

কাজ করতে করতে, বুক ভারী হলেই, মায়েরা, সেই রুমে গিয়ে, নিজের বুকের দুধ, নিজেই দুয়ে, একটি পাত্রে করে, ফ্রিজে রেখে দেবেন। দিনের শেষে, সেই দুধই পান করবে বাচ্চা। আদর্শ পদ্ধতি নয় যদিও, কিন্তু, "নারী-পুরুষ সমান সমান অনেক যে তার আছে প্রমাণ"-এর আলোকোজ্জ্বল যুগে, এটি একটি বিকল্প ব্যবস্থা। যদি, রুম না থাকে, তবে আন্দোলন করতেই পারেন। তবে তার চাইতে ঢের বেশি জরুরি, চাকরি করতে যাওয়ার আগে, সকালবেলায়, নিজের বুকের দুধ দুয়ে, পাত্রে রেখে আসবেন বাড়িতে।

আর একটি কথা, কতদিন খাওয়াবেন বুকের দুধ? ছয় মাসের পর যখন অন্নপ্রাশন, ছয় মাসের পর যখন ছোট্টো খুকি/খোকা, বিশেষভাবে প্রস্তুত খিচুড়ি (প্রণালী নিয়ে পরে একদিন) খাচ্ছে চুকচুকিয়ে, তখনও, খাওয়ান বুকের দুধ। খাওয়ান, মোটামুটি দুই বৎসর পর্যন্ত নিশ্চিন্তে।

তো সে যাই হোক, দুম-ফটাস করে, খতম করব বলে মোবাইল বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি যখন, তখন, হঠাৎ, টুং টাং। হোয়াটসঅ্যাপ-এ মেসেজ ঢুকল। আমার স্বপ্নবেলার প্রিয় বন্ধু,—গার্গী। 'কি লিখছিস বে? তুই তো শালা বড়ো লেখক এখন।' বললাম—'এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে।'

গার্গী, একথা শুনে, বড়ো জরুরি একটা পয়েন্ট মনে করিয়ে দিল। 'পার্থ, তোর লেখা তো এখন লোকজন পড়ে . . . প্লিজ় বলিস . . . এই যে মা মাসি ঠাকুমা এসে বলে—"তোমার বাচ্চা কাঁদছে তো বউমা, তার মানে তোমার বুকে দুধ হচ্ছে" . . . এসব ভাটের কথা।'

গার্গী, বন্ধু আমার, তোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না। তাহলে তো আবার লাথি মারবি ছেলেবেলার মতো। তাই তোরই কথার ধুয়ো ধরে শুধু এটুকুই বলি, সুস্থ বাচ্চা, ভরা পেট বাচ্চাও কাঁদে। এর সঙ্গে, বুকে দুধ

এই যে মা মাসি ঠাকুমা এসে বলে—"তোমার বাচ্চা কাঁদছে তো বউমা, তার মানে তোমার বুকে দুধ হচ্ছে" . . . এসব ভাটের কথা।'

না হওয়ার সম্পর্ক থাকে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। মা ঠাকুমা-কে গুলি মারুন, "ডাবলু.এইচ.ও" এবং চিকিৎসকে আস্থা রাখুন। নিজের বাচ্চাকে বক্ষ নিঃসৃত অমৃত পান করিয়ে, দেবতুল্য করে তুলুন।

এটি, একজন অসুররূপী চিকিৎসকের বিনীত প্রার্থনা।

পুঃ--

মা,

এ জগতে মাতৃসুধার ঋণ শোধ করা বোধকরি, অসম্ভব। কিন্তু তবুও, এই একটুও,

কোথাও-ও, যদি কোনোভাবেও, স্বীকৃতি দেবার সুযোগ থাকে . . . থাকে, ঋণ স্বীকারের অধিকার,

তবে, জেনে রেখো মা আমার, আমি, আজকে, অনেকের প্রিয় সব্যসাচী হয়ে উঠেছি, শুধু তোমারই সুধার গুণে। তোমার মনে আছে কিনা জানিনে মাগো, কিন্তু আমার আছে দিব্যি, আমি নার্সারিতেও দুধ খেতে চাইতাম ছটফটিয়ে। শেষকালে, তুমি শ্রেষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করলে। তোমার আর পিতার সঙ্গে দেখতে গিছলাম একখানি নাটক—"কেনারাম বেচারাম"। সেই নাটকে, কোনো এক চরিত্রের দাঁত তোলা হয়েছিলো পটাস পটাস। আমি ভয় পেয়েছিলাম বেজায়। এবং তুমি, বাড়ি ফিরে বলেছিলে—'আর যদি দুদু খাব বলিস, ওই কেনারামের মতো দাঁত তুলে নেবে ডাক্তার।' আমি, অবশেষে, ক্ষান্ত দিয়েছিলাম।

মা,

তোমারই গুণে, আমি তাই আজ

অসুর হয়েও

"অমৃতস্য পুত্রাঃ" স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সব্যসাচী সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, উত্তরবঙ্গের একটি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার।

সাদা তোয়ালে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

রাস্তা উঁচু হওয়ায় পানিহাটি হাসপাতাল তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। এই ঘোর বর্ষাতেও 'পানি হাটি' হচ্ছে না। বরঞ্চ স্কুটার নিয়ে শুকনো রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাচ্ছি ইমার্জেন্সির সামনে।

হাসপাতালের রাস্তায় মাছ ধরতে পারছে না বলে অনেকেরই মন খারাপ। রিকশাওয়ালাদের মন আরও খারাপ। আগে বর্ষার সিজিনে এই কোমর জলে ডোবা রাস্তার কল্যাণে তাদের বেশ ভালোই আয় হত।

তবে আমার খারাপ লাগছে না। তার প্রধান কারণ পায়ের চুলকানি রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি। মাসের পর মাস জমা জল ভেঙে হাসপাতালে যাওয়ার ফলে গোটা বর্ষাকাল দুই পা চুলকাত। সে যেমন-

ওয়ার্ডে ঢুকেই আমি চিৎকার শুরু করি 'বাড়ির লোক—বাইরে যান . . . বাড়ির লোক বাইরে যান . . .' দু-চারজন গোঁয়ার ব্যক্তি থাকেন। তাঁরা কিছুতেই বার হতে চান না। কিন্তু আমরাও ছাড়ার পাত্র নই। যতক্ষণ না পর্যন্ত সব বাড়ির লোক বাইরে বেরোচ্ছে ততক্ষণ রোগী দেখা শুরু করি না।

তেমন চুলকানি নয়। সেট্রিজিন, অ্যাভিল, ফেক্সোফেনাডিন সব ফেল মেরে যেত। নীচু হয়ে চুলকাতে চুলকাতে কোমরে ব্যথা হয়ে যেত। এবং সেই ব্যথা এখনও আছে। চুলকাতে গিয়ে জামার পকেট থেকে পড়ে একটি মোবাইল শহিদ হয়েছে।

তবে এটুকু ছাড়া পানিহাটি আছে পানিহাটিতেই। যাইহোক, জলের গল্প অন্য একদিন শোনানো যাবে। আজ 'সাদা তোয়ালে'-র গল্প শোনাব বলে লিখতে বসেছি। সেই গল্পে ফেরত আসি।

ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে ঢুকে আমার প্রথম কাজ বাড়ির লোককে ওয়ার্ড থেকে বের করা। আমাদের ছোটো হাসপাতাল। রোগীরা বেশিরভাগই স্থানীয়। তাদের বাড়ির লোকজন গেটম্যানের দুর্বল আপত্তি শুনতে চায় না। ওয়ার্ডে তাদের অবাধ যাতায়াত।

ওয়ার্ডে ঢুকেই আমি চিৎকার শুরু করি 'বাড়ির লোক—বাইরে যান . . . বাড়ির লোক বাইরে যান . . .' আমার গলার আওয়াজ শুনেই ওয়ার্ডের সিস্টার এবং আয়ারা আরও কুড়ি-ত্রিশ ডেসিবেল জোরে চিৎকার শুরু করেন। দু-চারজন গোঁয়ার ব্যক্তি থাকেন। তাঁরা কিছুতেই বার হতে চান না।

কিন্তু আমরাও ছাড়ার পাত্র নই। যতক্ষণ না পর্যন্ত সব বাড়ির লোক বাইরে বেরোচ্ছে ততক্ষণ রোগী দেখা শুরু করি না।

এই বাড়ির লোককে বার করার ব্যপারটা আমি শিখেছিলাম মেডিক্যাল কলেজে দীপাঞ্জন স্যারের কাছ থেকে। মেডিক্যাল কলেজে অ্যাকিউট মেল ওয়ার্ডে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ রোগীরা ভর্তি থাকত। মেঝে বারান্দা এমনকী বিছানার তলায় পর্যন্ত রোগী ভর্তি হত। আর রোগীর সংখ্যার দ্বিগুণ থাকত, তাদের বাড়ির লোক। কে যে বাড়ির লোক আর কে রোগী, মাঝে মাঝেই বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠত। রোগীর বদলে রোগীর বাড়ির লোক ইঞ্জেকশন পেয়ে গেছে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

. . . সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। সংক্ষেপে ইতিহাস নিলাম। কোনো জায়গা থেকে রক্ত পড়ে না। মাসিক খুব কম হয়। জ্বর আসে না। . . .

দীপাঞ্জন স্যার ওয়ার্ডে ঢুকেই প্রথমে বাড়ির লোককে চিৎকার চেঁচামেচি করে বের করতেন। তাঁর একটা বিখ্যাত ডায়লগ ছিল, 'এখানে থেকে কী করবি, তারচেয়ে তোরা বাড়ি গিয়ে একটু পড়াশুনো কর। একটু শিক্ষিত হ।'

আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। এবার সরাসরি গল্পে ফেরত আসি। গতকাল রাউন্ড দিচ্ছি মেয়েদের এক নম্বর ওয়ার্ডে। ওয়ার্ডে বেশ ভিড়। দু-টি করে বেডে তিনজন করে রোগী আছে। বেশ কিছু রোগীকে ছুটি না দিলে এরপর নতুন রোগীকে জায়গা দেওয়া যাবে না।

গোটা তিনেক মেয়ে ঘুমের ট্যাবলেট, একজন ডেটল, আর দু-জন ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে ভরতি হয়েছে। সকলেই দিব্যি সুস্থ আছে। এদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। বিষ খাওয়া রোগীদের

ভগবানের নামে শপথ করে (মুসলমান হলে আল্লার নামে) বলতে হবে জীবনে আর ওসব খাবে না। তবেই ছুটি হবে।

তবে আজকাল ভগবান-টগবান কেউ মানে না। তাই দু-দিন বাদেই একই লোক আবার কেরোসিন তেল খেয়ে ভর্তি হয়।

দ্রুত রোগী দেখছি। আরও দুটো ডায়েরিয়ার ছুটি হল। একজন জ্বরের রোগীর রাতের পর আর জ্বর আসেনি। স্ট্রোকের রোগীটি অনেকদিন ভর্তি আছে। উন্নতি অবনতি কিছুই হচ্ছে না। একেও বাড়ি পাঠাই। দশটা ছুটি হল। আরও গোটা পাঁচ-ছয়েক ছুটি হলে ওয়ার্ডটা একটু খালি হবে।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মহিলা ভর্তি হয়েছে। ভয়ংকর দুর্বলতা। মাথা তুলে বসতেই পারছে না। চোখের পাতা টেনে দেখলাম একদম সাদা। সিভিয়ার অ্যানিমিয়া। সংক্ষেপে ইতিহাস নিলাম। কোনো জায়গা থেকে রক্ত পড়ে না। মাসিক খুব কম হয়। জ্বর আসে না। সেরকম উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। হিমোগ্লোবিনসহ দরকারি পরীক্ষা করতে দিলাম। মনে হচ্ছে দু-তিন বোতল রক্ত দিতে হবে।

একজন রোগীর পেছনে খুব বেশি সময় ব্যয় করা যাবে না। এখনও তিনটে ওয়ার্ড বাকি। পরের রোগীর কাছে চলে আসলাম। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কিছু খচ খচ করছিল। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিচ্ছিল, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। যেটা আমি ধরতে পারছি না।

দুপুর দুটো নাগাদ ছুটি লেখা শেষ করে ওই মহিলা রোগীর কাছে গেলাম। এখন হাতে সময় আছে। একটু ভালোভাবে দেখা যাবে।

মহিলার পরনের শাড়ি রংচটা, ময়লা। . . . গা থেকে বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ। অথচ মেয়েটির পায়ের কাছে একটি নতুন ছোটো সাইজের ট্রাভেল ব্যাগ। সেটির চেন খোলা। এবং তার থেকে উঁকি মারছে একটি ধপধপে সাদা তোয়ালে।

রোগী এবং রোগীর আশপাশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে খচখচানির কারণ বুঝতে পারলাম। খচখচানির কারণ একটি ধপধপে সাদা তোয়ালে।

মহিলাটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বসবাস দারিদ্রসীমার নীচে। পরনের শাড়ি রংচটা, ময়লা। অনেক জায়গায় ফেসে গেছে। চামড়ায় জায়গায় জায়গায় হাজা হয়েছে। গা থেকে বোটকা গন্ধ বেরুচ্ছে। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ।

অথচ মেয়েটির পায়ের কাছে একটি নতুন ছোটো সাইজের ট্রাভেল ব্যাগ। সেটির চেন খোলা। এবং তার থেকে উঁকি মারছে একটি ধপধপে সাদা তোয়ালে।

মেয়েটির সাথে এই ব্যাগ কিছুতেই মেলানো যায় না। বুঝলাম এরজন্যই আমার মনে অস্বস্তি হচ্ছিল।

গত এক বছরে সে বেশ কয়েকবার রক্ত দিয়েছে। এবং তার বিনিময়ে দেওয়াল ঘড়ি, টিফিন বক্স, কাপ সেট ইত্যাদি পেয়েছে। সঙ্গে বিরিয়ানির প্যাকেট।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই ব্যাগ, এই তোয়ালে কোথায় পেলে?'

মেয়েটি কিছুতেই বলতে চাইছে না। আমি ভাবছি বেশি জোরাজুরি করা উচিত হবে কিনা। যদি বলে বসে, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আপনি এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

অবশেষে মেয়েটি বলল, গত পরশু এক স্বেচ্ছায়(!) রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়ে সে ওই দু-টি মহার্ঘ বস্তু পেয়েছে।

গত এক বছরে সে বেশ কয়েকবার রক্ত দিয়েছে। এবং তার বিনিময়ে দেওয়াল ঘড়ি, টিফিন বক্স, কাপ সেট ইত্যাদি পেয়েছে। সঙ্গে বিরিয়ানির প্যাকেট।

কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে রক্ত দেয়নি। শুধু জিনিসগুলি পাওয়ার লোভে সে রক্ত দিয়েছে। এমনকী এক মাসে দু-বার পর্যন্ত রক্ত দিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে ওয়ার্ড থেকে বেড়িয়ে এলাম। কাকে গালাগালি দেব। এই মেয়েটাকে, রক্তদান শিবিরগুলোর উদ্যোক্তাদের, নাকি মেয়েটির অভাবের কারণ যারা তাদের। তাদের মধ্যে কি আমি নিজেও পড়ি না?

গেটের সিকিউরিটির জয়ন্তদা অনেকদিন ধরেই হাসপাতালে একটা রক্তদান শিবির করার কথা বলছে। রক্ত দেওয়ার পর শুধু একপিস সেদ্ধ ডিম আর এক গ্লাস দুধ। ব্যস।

আমিই বলেছিলাম, একটা মেমেন্টো অন্তত না দিলে লোকে রক্ত দিতে উৎসাহ পাবে কেন?

এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বুঝতে পারছি জয়ন্তদাই ঠিক।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

ডাক্তারিতে প্রযুক্তি ও চিকিৎসকের নিরাময়-স্পর্শ

ডা. অপূর্ব

গত শতকের শেষ দশকের মাঝামাঝি সময় (মোটামুটি ১৯৯৪-৯৫) থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের মেজাজে যেন বেশ খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞান না, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের সমস্ত ধারাতেই এই পরিবর্তন চোখের সামনে দেখতে দেখতে আমাদের প্রজন্মের বড়ো হওয়া, আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষা নেওয়া। তবে আমরা আপাতত এই লেখায় শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিবর্তনের কথাই বলব। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আর পাঁচটা ধারার মতোই শেষ ২০-৩০ বছরে ক্রমেই কুশলী হয়ে উঠেছে। এই কৌশল-প্রক্রিয়া, যার আরেক নাম প্রযুক্তি, সে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও অনিবার্য অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির মধ্যে যেন কোনো তফাত নেই আর এখন। রোজ নতুন নতুন 'প্রযুক্তি'-র উদ্ভাবনই যেন এখনকার বিজ্ঞান। বিজ্ঞান, শিল্প, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, গবেষণা সমস্তই সেই এক প্রযুক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসেবে হাজির হচ্ছে আমাদের কাছে। আজকাল 'শিল্প' বললেই লোকে বোঝে 'কারখানা' বা ইন্ডাস্ট্রি।

এখন গল্পটা প্রায় পুরোপুরি উলটো। ডিগ্রি আর ডাক্তারের জ্ঞানের গৌরব বাড়ায় না, ডিগ্রি নিজেই এখন গৌরব হয়ে বসেছে। ডাক্তার এখন প্রাথমিকভাবে চায় ডিগ্রি, উপাধি, নামের পেছনে ইংরেজি অ্যালফাবেটের হরেকরকম কম্বিনেশন।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই ক্রমবিবর্তন, এই সময়ের ডাক্তারদের বিজ্ঞানশিক্ষা ও তার প্রয়োগে কী কী পরিবর্তন এনেছে সেটা দেখতে চাইব আমরা। অবশ্যই এ-নিয়ে বিতর্কের অবসর আছে, তবে সেই বিতর্কটাও শুরু করা দরকার।

শুরুর গল্প

আমাদের গল্পের শুরুটা ডাক্তারি শিক্ষার শুরু থেকে, মানে মেডিক্যাল কলেজ থেকেই। চিকিৎসাপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির আগে পর্যন্ত ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজে শিখত রোগনির্ণয়ের প্রাথমিক কিছু ধাপ। তারপর আসল শিক্ষা শুরু হত রোগীর বিছানার পাশে। ডাক্তারের আসল কৃতিত্ব যেখানে, সেই রোগনির্ণয় জিনিসটা ছিল একটা শিল্প। (এখানে 'শিল্প' বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি চারুকলা বা ফাইন আর্ট-এর সমগোত্রীয় কিছু, কারখানা নয়)। ডাক্তার সেই শিল্পনৈপুণ্য অর্জন করত রোগীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে, সময় দিয়ে। তাকে দেখে-শুনে-ছুঁয়ে।

সে এক লম্বা কিস্‌সা। যেন ডাক্তার আর রোগের কানামাছি খেলা। এ যেন ওয়াটসনের হোমসগিরি। রোগ যেন খুনি, রোগীর শরীরে রেখে যায় ক্লু। যার-তার চোখে সেই ক্লু ধরা পড়ে না। ডাক্তার এইখানেই প্রশিক্ষিত। ডাক্তারের প্রশিক্ষিত চোখে ধরা পড়ে ক্লু, যার যেকোনোটিই আলাদা করে বা এককভাবে অর্থহীন। একে একে সেই সংকেত জুড়ে জুড়ে ডাক্তার পড়তে পারত রোগের ভাষা। এইভাবেই আস্তে আস্তে হোমসগিরির নেশা মিশে যেত ওয়াটসনের (থুড়ি ডাক্তারের) রক্তে। সেসময় ডিগ্রি, পদক, উপাধিলাভ হত না তা নয়। কিন্তু সেগুলো মুখ্য ছিল না।

এখন গল্পটা প্রায় পুরোপুরি উলটো। ডিগ্রি আর ডাক্তারের জ্ঞানের গৌরব বাড়ায় না, ডিগ্রি নিজেই এখন গৌরব হয়ে বসেছে। ডাক্তার এখন প্রাথমিকভাবে চায় ডিগ্রি, উপাধি, নামের পেছনে ইংরেজি অ্যালফাবেটের হরেকরকম কম্বিনেশন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ডাক্তার গ্র্যাজুয়েট হয়, আগের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু এখনকার মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরা আজ থেকে বছর কুড়ি

রোগের প্রয়োজন যদি-বা বুঝি, রোগীর সামর্থ্যের কথা, পরিবেশের কথা মাথায় আসে না, টেক্সটবুকের প্রোটোকল টুকে দিই প্রেসক্রিপশনে।

আগেকার মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সমকক্ষ নয়। গ্র্যাজুয়েশন করেও আমাদের অনেকেই ঠিকমতো রোগের ইতিহাস নিতে জানি না, রোগীর শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা (Clinical Examination) করতে পারি না, রোগের 'ক্লু' আমাদের চোখকে ফাঁকি দেয়। রোগীর সামগ্রিক সমস্যা বুঝে উঠতে পারি না। পোস্টগ্র্যাজুয়েশন

এন্ট্রান্সের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন বা এমসিকিউ সলভ করতে তথ্য কাজে লাগে। তাই আমাদের মগজে তথ্য প্রচুর। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ধারণা—না থাকার মতোই, প্রয়োগ আরও অল্প। আমরা অনেকেই রোগীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না ভালো করে। যান্ত্রিক আচরণ করি, পরীক্ষা করার আগে রোগীর অনুমতি নিতে ভুলে যাই। আমরা রোগীর সঙ্গে সময় কম কাটাই। ডিউটি ফাঁকি দিয়ে পিজি এন্ট্রান্সের প্রিপারেশন নিই। অসাধারণ সব রোগের নাড়িনক্ষত্র (পড়ুন এমসিকিউ) 'জানি', কিন্তু সাধারণ রোগ 'চিনি না'। না বুঝে, প্রয়োজন ছাড়াই হরেকরকম টেস্ট, পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের লেখা অভ্যাস হয়ে যায় ইন্টার্নশিপের সময় থেকে। রোগের প্রয়োজন যদি-বা বুঝি, রোগীর সামর্থ্যের কথা, পরিবেশের কথা মাথায় আসে না, টেক্সটবুকের প্রোটোকল টুকে দিই প্রেসক্রিপশনে। রোগীর শারীরিক-মানসিক-সামাজিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে ব্লাড টেস্ট রিপোর্টের কিছু সংখ্যায় বা এক্সরে-ইউএসজি-সিটিস্ক্যানের কয়েকটা দাগে পরিণত হয়। অর্জুনের নিশানায় ছিল যেমন শুধু পাখির চোখটুকু, সেরকম।

কেন হল এই দশা?

দোষ আমাদের একার না। আমরা এসব ইচ্ছে করে করি এমনটা নয়। আমাদেরও প্রত্যেকদিন দেখতে হয় শ-য়ে শ-য়ে রুগী, যেন টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। একটা এমসিকিউ-এর জন্যে আমরা যতটা সময় দিই, তার চেয়ে কম সময়ে আমাদের একটা পেশেন্টের রোগের কথা ভেবে ফেলতে হয়। এসব আমাদের দোষ নয়। এটাই এখনকার নিয়ম, করতে হয় তাই আমরা করি।

এই অবস্থা একদিনে হয়নি। এখনকার যাঁরা শিক্ষক তাঁদের শিক্ষার সময়টারও বেশিরভাগটাই কেটেছে চিকিৎসাপ্রযুক্তির ধকধক করে বেড়ে ওঠা দেখতে দেখতে। হাই-টাচ (High-touch) ডাক্তারের

বেশিরভাগ ডাক্তার ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ছাড়াই গ্র্যাজুয়েট হয়ে যায়, সংখ্যার ঘাটতি ঠিক রাখতে। সাধারণ চিকিৎসার 'চ'-ও না জেনে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে যায়।

স্পর্শের জায়গায় এখন যুগের চাহিদা হল হাই-টেক (High-Tech) চিকিৎসা। নতুন থেকে নতুনতর প্রযুক্তির বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পর্কে আপডেটেড থাকতে পারে এমন হাইটেক ডাক্তার। সময় পালটেছে, তার সঙ্গে মূল্যবোধের ধরনও পালটেছে। একসময় কঠিন পরিশ্রম, ওয়ার্ডে দিনরাত পড়ে থাকা, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, সীমিত উপকরণের সীমাতিরিক্ত সদ্ব্যবহার, নির্ভুলতা—এসব নিয়ে অনমনীয় জেদ বিরল ছিল না। এখন মেডিক্যাল কলেজে খুব কম দিনই সেদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রফেসর সময়ে আসেন। ঠিক সময়ে আউটডোরে বসেন না বেশিরভাগ সিনিয়র ডাক্তার। শনি-রবিবার রাউন্ডে আসেন না। সময়ের আগে বেরিয়ে যান। সন্ধ্যেয় আরেকবার প্রিন্সিপাল অফিসের সামনে ঢুঁ মেরে যান বায়োমেট্রিকে একজিট টাইম ঠিক রাখতে। রাজনৈতিক দলের নেতা এলে চেয়ার ছেড়ে দেন প্রিন্সিপাল। এই অসততা চুঁইয়ে চুঁইয়ে জুনিয়র ডাক্তার, রেসিডেন্ট, ইন্টার্ন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নামে। সততা নিয়ে অনমনীয়তা দাদু-ঠাকুমার রূপকথার গল্পের মতোই কল্পলোকের জিনিস হয়ে উঠেছে এখন। বেশিরভাগ ডাক্তার ন্যূনতম প্রশিক্ষণ ছাড়াই গ্র্যাজুয়েট হয়ে যায়, সংখ্যার ঘাটতি ঠিক রাখতে। সাধারণ চিকিৎসার 'চ'-ও না জেনে মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হয়ে যায়।

চিকিৎসকের নিরাময়-স্পর্শ

হাই-টাচ (High-touch) ডাক্তার বলতে আমরা কী বোঝাতে চাইছি সেটা একটু স্পষ্ট করা দরকার। আমরা এমন এক ডাক্তারি প্র্যাকটিসের কথা বলতে চাইছি যেখানে রোগীর রোগের সম্পূর্ণ ইতিহাস নেওয়া, সাধারণ ও বিশেষ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা (General and Systemic Examination) অবশ্যকর্তব্য হবে। তারপর আসবে পরীক্ষানিরীক্ষা (Lab Investigation and Imaging), প্রয়োজনমাফিক । অপ্রয়োজনে কোনো পরীক্ষা নয়। সহজতর, কম খরচের পরীক্ষা যথেষ্ট হলে অহেতুক বেশি

ঠিক সময়ে আউটডোরে বসেন না বেশিরভাগ সিনিয়র ডাক্তার। শনি-রবিবার রাউন্ডে আসেন না। সময়ের আগে বেরিয়ে যান। সন্ধ্যেয় আরেকবার প্রিন্সিপাল অফিসের সামনে ঢুঁ মেরে যান বায়োমেট্রিকে একজিট টাইম ঠিক রাখতে। রাজনৈতিক দলের নেতা এলে চেয়ার ছেড়ে দেন প্রিন্সিপাল।

দামের বা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা না করানো। একটু নির্ভুল, যৌক্তিক ও একইসঙ্গে সহমর্মী হলেই এটুকু করা যায়। শুনতে সোজা মনে হলেও এটাও বেশ কঠিন কাজ। কারণ আজকাল ডাক্তারি প্র্যাকটিসের ভিত্তিই হল Evidence Based Medicine (প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা)। তত্ত্বগতভাবে Evidence Based Medicine সবচেয়ে যৌক্তিক হলেও, কোন এভিডেন্স যে কোন ওষুধ কোম্পানির গোপন ল্যাবে কীভাবে জন্ম নেয়, তা দেবা ন জানন্তি।

উলটোদিকে হাই-টেক মেডিসিন এই ইতিহাস, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষা এড়িয়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় ল্যাব আর স্ক্যান সেন্টারের দুয়ারে। ডাক্তারকে মাথা খাটাতে হয় না। ইনভেস্টিগেশন আর ইমেজিং থেকে যা রিপোর্ট বেরোয় ডাক্তার তার এভিডেন্স বেসড চিকিৎসা লেটেস্ট প্রোটোকল থেকে টুকে দেন। দেখে-শুনে-ছুঁয়ে দেখার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে রোগী আর ডাক্তারের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। ডাক্তার যে রোগীর শরীরের

এরকম গুরু প্রয়োজন ছিল যারা রোগের ইতিহাস, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার ওপর বেশি জোর দেবেন . . . সবরকম সমস্যার জন্যে একটা করে ওষুধ লিখে না দিয়ে, এটা বুঝবেন ও বোঝাবেন যে কখনো কখনো কিছু না করাটাই অনেক কিছু করা।

সমস্যাটুকুর বাইরেও তার জীবন, মানসিক অবস্থা নিয়েও ভাবেন, খোঁজ নেন রোগী তা অনুভব করে না। সে ভাবে ডাক্তার টাকা নিচ্ছে, যন্ত্র সারাচ্ছে। শরীরের সমস্যাটুকু না সারলেই তাই রাগ গিয়ে পড়ে ডাক্তারের ওপর। যদি ডাক্তার আর রোগী বন্ধু হত তাহলে সব সমস্যা যে সারানো যায় না, সব মানুষকে যে বাঁচানো যায় না, এর চেয়ে বেশি কিছু যে ডাক্তার চাইলেও করতে পারে না, সে-কথাটা রোগীকে বলা যেত, রোগী শুনতও হয়তো অনেকটা।

এখনকার মেডিক্যাল কলেজের তরুণ শিক্ষকেরা কলেজে সময় দেওয়া, জুনিয়রদের পড়ানোর কাজের চাইতে কি বাইরে পশার জমানোর চেষ্টা একটু বেশিই করে ফেলেন? সিনিয়র প্রফেসরেরা নিজেদের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত, কলেজে নাম লেখানো আছে, সেখানে আসেন। এলেও শিক্ষাদীক্ষার বেশিরভাগ সময়টাই চলে যায় সেমিনার, লেকচার, থিসিস করতে। জুনিয়র হাউসস্টাফ, ইন্টার্নরা তাই প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নেয় এক-দু-বছরের বড়ো দাদাদিদিদের কাছ থেকে, যাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

শিক্ষকেরা যদি সময়ানুবর্তী হন, পড়ানোয় সময় ও শ্রম দেন, যদি রোগের সাধারণ গতিপথ (Natural History), রোগের লক্ষণ, উপসর্গ, রোগ-নির্মাণ (Pathophysiology)-র উপর বেশি জোর দেন, তাহলে শিক্ষার্থী ডাক্তারেরাও সেরকম হয়। চিকিৎসাবিদ্যা একান্তভাবেই গুরুমুখী বিদ্যা, শুধু পড়ে লিখে হয় না সেটা। ।

এরকম গুরু প্রয়োজন ছিল যারা রোগের ইতিহাস, ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার ওপর বেশি জোর দেবেন, যারা জানবেন কোথায় কোন পরীক্ষানিরীক্ষা করাতে হয়, যারা রোগের প্রাথমিক দিশা খোঁজার কাজে হাই-টেক পরীক্ষানিরীক্ষা না করে কেবলমাত্র প্রয়োজনে নিজের ডায়গনোসিসকে সুনিশ্চিত করার জন্যে পরীক্ষানিরীক্ষা করাবেন। যারা পরীক্ষানিরীক্ষা করানোর খরচ ও সেটা থেকে পাওয়া তথ্যের উপযুক্ততা (Cost-benefit)-র তুল্যমূল্য বিচার করতে সক্ষম। যারা সবরকম সমস্যার জন্যে একটা করে ওষুধ (a pill for every ill) লিখে না দিয়ে, এটা বুঝবেন ও বোঝাবেন যে কখনো কখনো কিছু না করাটাই অনেক কিছু করা। যারা বোঝেন যে বেশিরভাগ রোগীই নিজে-নিজেই সুস্থ হয়ে ওঠেন, আমাদের কেরামতির জন্যে নয়। কিন্তু এরকম শিক্ষক আজ সুন্দরবনের বাঘের চেয়েও বিরলতর।

কলেজের তরুণ শিক্ষকেরা জুনিয়রদের পড়ানোর কাজের চাইতে কি বাইরে পশার জমানোর চেষ্টা একটু বেশিই করে ফেলেন? সিনিয়র প্রফেসরেরা নিজেদের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত, কলেজে নাম লেখানো আছে, সেখানে আসেন। এলেও শিক্ষাদীক্ষার বেশিরভাগ সময়টাই চলে যায় সেমিনার, লেকচার, থিসিস করতে।

'দোষ কারো নয় গো মা . . .' বলেই শেষ করে দেওয়া যায়। বলা যায়, কোনো এক মহাপুরুষ যেমন বলেছিলেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেকোনো কিছুই বিষ'। আমাদের সময়, এই কালপর্ব, এই বিষের জ্বালাতেই জর্জরিত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভোগ, লিপ্সার অহেতুক অসম্বন্ধ সমাবেশ চারিদিকে। ডাক্তার তো এর মধ্যেকারই মানুষ, চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই সমাজেরই ফসল। তা আর কী করে আলাদা রকমের হবে?

তবু, মনের কোথাও যেন আমাদের আস্থা থাকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে, ডাক্তার-রোগীর মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনায়, চিকিৎসকের নিরাময়কারী হাতের পুনরুত্থানে!

সুত্র: Hyposkillia: Deficiency of Clinical Skills. *Herbert L. Fred, MD Professor, Department of Internal Medicine, Guest Editorial Texas Heart Institute Journal Volume 32, Number 3, 2005.* স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

ওষুধের দুনিয়া: বাজার যখন রাজা

মিল্টন প্যাকার

ওষুধ কোম্পানিগুলো এখন শুধু দু-ধরনের নতুন ওষুধ তৈরি করছে। ক্যান্সারের ওষুধ আর নানা বিরল অসুখের ওষুধ। কেন? কারণ দু-টি ক্ষেত্রে লোকে মারাত্মক ধরনের বেশি দাম দিতে রাজি।

কী ধরনের মারাত্মক দাম? ক্যান্সার আর নানা বিরল অসুখের যেসব নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবিত হচ্ছে সেগুলির দাম রোগী পিছু বছরে ৪ লক্ষ ডলারের বেশি (টাকার অঙ্কে আড়াই কোটি টাকার বেশি), এমনকী কোনো কোনো ক্ষেত্রে বছরে ১০ লক্ষ ডলার (টাকার অঙ্কে ৬ কোটি টাকার মতো)। শুধু তাই নয়, এই দাম দিনে দিনে বাড়ছে।

এতে কার ক্ষতি? হয়তো ভাবছেন, ক্যান্সার বা ওই সব বিরল অসুখে যারা ভুগছেন, ক্ষতি তাদেরই। তাদের বেশি পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ নয়।

সরকার বা বেসরকারি কোম্পানি (যারা তাদের কোম্পানিতে চাকুরিরতদের চিকিৎসার খরচ দেয়), যারা এই সব রোগীদের জন্য এই অসম্ভব বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়, তারা এই বাড়তি ব্যয়ের ফলে অন্য সব ক্ষেত্রে খরচ কমাতে থাকে। যেমন হয়তো ডায়াবেটিস রোগীদের চিকিৎসার খরচ কমাতে তুলনায় কম দামি ওষুধের দিকে ঝোঁকে, চিকিৎসকদের চাপ দেয় কম দামি ওষুধ লিখতে। কম দামি ওষুধটি একই রকম কাজের হলে অবশ্য এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সেটি কিছুটা কম কাজের হলেও চিকিৎসকেরা সেটি লিখতে বাধ্য হন।

এর মানে হল, যাদের ক্যান্সার বা কোনো বিরল অসুখ নয়, অন্য অসুখ, কিছু কিছু ওষুধের মারাত্মক দামের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাঁরাও।

শুধু তাই নয়। কিছুদিন আগে গোল্ডম্যান স্যাক্স একটি রিপোর্ট (সিএনবিসিতে টি কিম-এর প্রবন্ধ দেখুন) প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, খুব ভালো কাজ করে এমন ওষুধ উদ্ভাবন করতে ওষুধ কোম্পানিগুলি খুব একটা উৎসাহী নয়। ১০ এপ্রিল 'জিনোম রেভলিউশন' নামে সালভিন রিখটারের এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে:

> জিন থেরাপি, জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করা কোষ দিয়ে চিকিৎসা ও জিন পরিবর্তন (জিন এডিটিং)-এর সবচেয়ে আকর্ষক একটি সম্ভাবনা হল 'এক ধাক্কায় সারিয়ে তোলো'। কিন্তু পুরোনো দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করার পদ্ধতিতে যেরকম দীর্ঘদিন ধরে (ওষুধ কোম্পানি) আয় হতে থাকে তার তুলনায় এই পদ্ধতির ব্যাপারটা অন্যরকম। . . . রোগী ও সমাজের কাছে এর মূল্য অনেক, কিন্তু জেনেটিক ওষুধ যারা তৈরি করে তাদের পক্ষে টাকা আসার ক্ষেত্রে এটি একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিতে পারে।

অর্থাৎ, কোনো কোম্পানি যদি এমন একটা নতুন ওষুধ তৈরি করে যা রোগীদের চট করে সারিয়ে দেবে, তাহলে তো রোগীদের সেই ওষুধ বেশিদিন ধরে নিতে হবে না, ফলে কোম্পানিটিও সেই ওষুধ বেচে দীর্ঘদিন ধরে লাভ করে যেতে পারবে না।

রিপোর্টে তাই লেখক প্রশ্ন তুলেছেন: 'রোগীদের সারিয়ে ফেলাটা কি সত্যিই কোনো সফল ব্যাবসার মডেল হতে পারে?'

'সমস্যা' সবচেয়ে বেশি সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে। গোল্ডম্যান স্যাক্স রিপোর্টে গাইলিড সায়েন্স-এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৩ সালে এই কোম্পানিটি হেপাটাইটিস সি-র চিকিৎসার নতুন ওষুধ 'সোভালডি' বের করে, আর তার এক বছর পর তারা 'হারভোনি' বেচার ছাড়পত্র পায়।

এ ওষুধ দু-টি হেপাটাইটিস সি চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। মাত্র তিন মাসের চিকিৎসায় এই ওষুধ দু-টি হেপাটাইটিস সি সম্পূর্ণ সারাতে সক্ষম। ওষুধ দুটোর দামও মারাত্মক। 'হারভোনি' যখন বাজারে এল তখন মার্কিন দেশে এর তিন মাসের কোর্সের দাম ছিল ৯৪,৫০০ ডলার (৫.৬৭ লক্ষ টাকা)। অথচ ভারতে একই ওষুধের তিন মাসের কোর্সের দাম মাত্র ৬০০ ডলার (৫৪ হাজার টাকা)। ভারতে এই দামে ওষুধটা বিক্রি করেও কোম্পানির নিশ্চয় লোকসান হচ্ছে না!

তা, এইরকম মারাত্মক বেশি দামে গোল্ডম্যান স্যাক্স কি খুশি? উঁহু!

শ্রীমতী রিখটার তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, ২০১৫ সালে এই হেপাটাইটিস সি-র ওষুধের বাজারের পরিমাণ সবচেয়ে ওপরে উঠেছিল—১২৫০ কোটি ডলার, কিন্তু তার পর থেকে এই বাজারটি ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে । গোল্ডম্যান কোম্পানি হিসেব করে দেখেছে যে, এবছর বাজারটি দাঁড়াবে ৪০০ কোটি টাকারও কম। স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনায় শ্রীমতী রিখটার খুশি নন।

কেন এমন হল? বাজারটি ছোটো হয়ে আসছে কেন? ওষুধের দাম কি কমানো হয়েছে? না। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে শ্রীমতী রিখটার লিখছেন,

> গিল্ড (যে কোম্পানি ওষুধটা তৈরি করেছে)-এর ব্যাপারটা একটা উদাহরণ, যেখানে হেপাটাইটিস সি সারানোর ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যই রোগীর সংখ্যা ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে . . . হেপাটাইটিস সি-র মতো সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রে রোগীদের সারিয়ে দেওয়ার অর্থ যারা নতুন নতুন মানুষের মধ্যে এই রোগের ভাইরাস নিয়ে যাবে তেমন রোগবাহী মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া। ফলে নতুন রোগীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

শ্রীমতী রিখটার আরও লিখেছেন,

> (গিল্ড) কোম্পানির হেপাটাইটিস শাখার দ্রুত উত্থান ও পতন একটা জিনিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। রোগকে পুরোপুরি সারিয়ে দিতে পারে এমন একটি ওষুধের সংখ্যা কমিয়ে দেয় . . . ।

অবশ্য সব রোগের ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলোর রোগী কমে যাওয়ার ভয় নেই। শ্রীমতী রিখটার লিখছেন, '. . . সাধারণ ক্যান্সারের মতো রোগের (যেগুলি সংক্রামক নয়) ক্ষেত্রে—যেখানে নতুন রোগী আসার মাত্রা একই থেকে যায়—ব্যাবসা এতটা ঝুঁকিবহুল নয়।'

তাহলে কোনো কোম্পানি যদি কোনো সংক্রামক ব্যাধি সত্যিকারের সারানোর ওষুধ তৈরি করতে চায় তাদের কি পুঁজি পেতে অসুবিধা হবে?

ভেবে দেখা যাক। ধরুন, একটি কোম্পানি এমন একটি নতুন ওষুধ তৈরি করতে চায় যার এক ডোজ়ে একটি অসুখ ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সেরে যাবে।

এবার বিনিয়োগকারীরা কী বলবে? তারা বলবে, ব্যাপারটা দারুণ। কিন্তু তোমার ওষুধটা যে বড্ড বেশি কার্যকর। এর থেকে তো তুমি নিয়মিত টাকা আসার ব্যবস্থা করতে পারবে না।

অর্থাৎ কিনা, তোমার ওষুধটাকে একটু কম কার্যকর করো। তাতে লোকেদের ওটা নিয়মিত খেয়ে যেতে হবে, আর তাতে তুমি অনেক বেশিদিন ধরে অনেক বেশি টাকা পেতে পারবে!

ধরুন, ওষুধ কোম্পানিটি এটা করতে রাজি হল না।

বিনিয়োগকারীরা এবার বলবে, বেশ, তা যদি না করো তাহলে এক কাজ করো। ওষুধটার দাম করে দাও আকাশছোঁয়া। ধরো, চিকিৎসার একটা কোর্সের জন্য (এক্ষেত্রে একটি ডোজ়) দাম রাখো ১০লক্ষ ডলার।

আপনাদের কী মনে হচ্ছে এই কাল্পনিক সংলাপে দামটা একটি বাড়াবাড়ি রকম বেশি বলা হল?

ভুল করছেন।

এ বছরেই স্পার্ক থেরাপিউটিক্স নতুন একটি ওষুধ বাজারে এনেছে। ওষুধটার নাম লাক্সটার্না। একটি মাত্র ডোজ়ে এক বিরল ধরনের অন্ধত্ব সারায় এটি। একটি চোখের জন্য এক ডোজ়ের দাম ৪,২৫,০০০ ডলার। অর্থাৎ, দু-চোখ সারাতে সাড়ে আট লক্ষ ডলার (টাকার হিসেবে ৫ কোটি টাকার বেশি)।

এতেই শেষ নয়, দাম আরও বাড়ছে।

২০১২ সালে ইউনিকিওর এন ভি নামের কোম্পানি গ্লাইবেরা (টিপারভোভেক) নামের একটি ওষুধ বের করল (লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এনজাইমটির অভাব থাকলে তার চিকিৎসার জন্য)। চিকিৎসার খরচ ১৬ লক্ষ ডলার (প্রায় দশ কোটি টাকা)। সারা বিশ্বে মাত্র একজন রোগী এই চিকিৎসাটি করে। আর কেউ এই মারাত্মক দাম দিয়ে ওষুধটি ব্যবহার করতে উৎসাহ দেখায়নি। দাম কম না করে কোম্পানিটি ওষুধটি বাজার থেকে তুলে নিল।

এসব উদাহরণ থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? বিজ্ঞানের এখনও মানুষকে নতুন নতুন উপহার দেওয়ার ক্ষমতা ফুরিয়ে যায়নি। ফুরিয়ে গেছে আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর মানবিকতা। কতখানি নীচে নামলে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি ভাবতে পারে যে অসুখ সারানোর ওষুধ বের করার ব্যাপারে কোনো কোম্পানিকে টাকা দেওয়া ঠিক হবে না!

তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা এবার কোন দিকে এগোব? আমরা এতদিন জানতাম আয়ু বাড়ানোর ব্যাপারটা ব্যয়সাপেক্ষ। এখন দেখা যাচ্ছে যে, অসুখ সারানোতে যথেষ্ট মুনাফা নেই!

টাকা কামাতে চান? আপনি তাহলে এমন ওষুধ তৈরি করুন যাতে কোনো অসুখ সারবে না, তবে কিছুটা কাজ হবে, লোকে সে ওষুধ ছাড়তে পারবে না। আয়ু কিছুটা কমলে কমুক! হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি, বিনিয়োগকারীদের দারুণ পছন্দ হয়েছে আপনার ওষুধ। যেমন ধরুন, আফিমজাত ওষুধ। ব্যথা ভুলিয়ে দেবে, কিন্তু অসুখও সারবে না, ওষুধও ছাড়তে পারবে না। হেঁ হেঁ!

ওহ্, ভুলেই গেছিলাম। এ ওষুধ তো কবেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

দেশ বিদেশের বস্তি জীবন ও স্বাস্থ্য সমস্যা

ধ্রুবজ্যোতি দে

ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি, বস্তি ও কলোনি, রাজধানী দিল্লি (দ্বিতীয় ভাগ)

(এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র জুন-জুলাই ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)

(৭)

অসরকারি সংস্থাগুলি যত বিস্তৃতি ও গভীরতা নিয়েই কাজ করুক বেশির ভাগ সময়ে তাদের পরিধি এক বা একাধিক এলাকায় সীমায়িত (যেমন 'হোপ' বা 'আশা') অথবা নির্দিষ্ট কিছু সমস্যায় (যেমন 'চেতন' বা 'চিন্তন') গণ্ডিবদ্ধ থাকে। উপরন্তু একই বস্তিতে একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপস্থিতি উন্নয়নের কাজে সমস্যা সৃষ্টি করে। উদাহরণ: কাঠপুতলি কলোনি বিস্থাপনে দুই সংস্থার কাজিয়া (ভেরোনিক দ্যুপঁ প্রমুখ, ১৪ জুন ২০১৪, *ই.পি.ডব্লিউ*)। প্রকৃতপক্ষে সার্বিক নগর পরিকল্পনার ভিত্তিতে সামগ্রিক বস্তিজীবনের যথাযথ মানোন্নয়ন সরকারি উদ্যোগ ছাড়া সম্ভবই নয়। যদিও দিল্লিতে বস্তি স্থানান্তরণ ব্যতীত বস্তিজীবনের মানোন্নয়নের কাজে সরকার এই সংস্থাগুলির ওপরই অনেকটা নির্ভরশীল থেকেছে।

সাধারণভাবে বস্তি স্থানান্তরণে যেকোনো সরকারের একটি নিহিত উদ্দেশ্য থাকে, সেটি হল খাস নগরের মূল্যবান জমি উদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন। দিল্লিও তার ব্যতিক্রম নয়। দিল্লিতে বস্তি স্থানান্তরণ তথা অপসারণের বড়ো ঢেউ ওঠে তিনবার; ১৯৫৮-তে দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (ডি.এম.সি.) গঠিত হওয়ার পর ১৯৬০-এর দশক জুড়ে, ১৯৭০-এর দশকে জরুরি অবস্থার সময়, যার জের চলে ১৯৮২-তে 'এশিয়ান গেমস'-এর আগে পর্যন্ত এবং নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে, ২০১০-এ দিল্লি 'কমনওয়েলথ গেমস'-এর প্রাক্‌কালে। প্রথম দুই দফায় নগরের প্রান্তে ৪৪টি নতুন কলোনিতে আড়াই লক্ষ বস্তিঘরের (ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি ও অননুমোদিত বস্তি সমেত) প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বাসিন্দাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় দফায় স্থানান্তরিত হয় আরও ১১টি কলোনি (*সিটিজ অফ দিল্লি, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ* ২০১৫)। বিপরীতে ঝকঝকে হয়ে ওঠে দিল্লির খাস অঞ্চল। প্রসঙ্গত, ২০০৪-এ যমুনা তীর সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে পূর্ব পাড়ের পুষ্‌তা কলোনির প্রায় দেড় লক্ষ আবাসিককে একটি জনস্বার্থ মামলার রায়ে উচ্ছেদ করা হয়।

লক্ষণীয় হল, এই বিপুল সংখ্যক ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি (জে.জে.সি) ও বস্তিবাসী মানুষ দিল্লির মাত্র ৬% জমিতে বসবাস করেন, যার অধিকাংশই সরকারি মালিকানাধীন (ভেরোনিক দ্যুপঁ, ১২.০৭.২০০৮, *ই.পি.ডব্লিউ.*)। *ডি.ইউ.এস.আই.বি*-র তথ্যানুযায়ী (২০১৪) এই জে.জে. কলোনিগুলির মোট জমির ৬৩% কেন্দ্র, ৩২% রাজ্য ও ৫% পুর কর্পোরেশনগুলির অধীন। তাই এই জমি উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের 'দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ডি.ডি.এ.)' বেশি তৎপর। ১৯৬২ থেকে ডি.ডি.এ. তৈরি করে একাধিক *মাস্টার প্ল্যান*, যার প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল বস্তিবাসীদের নগরকেন্দ্র থেকে দূরে পাঠানো। তবে অপসারিত প্রত্যেক বস্তিবাসীই যে স্থানান্তরিত বা পুনর্বাসিত হয়েছেন তা কিন্তু নয়। পুরসভার সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৭০-৮০-তে সীমাপুরি, দক্ষিণপুরিতে গড়ে ওঠা নতুন কলোনিগুলিতে যাঁরা থাকছেন তাঁদের ৮০%ই কোনো বস্তিরই আদি বাসিন্দা নন, জানিয়েছে বস্তিবাসীদের অধিকার রক্ষা সংগঠন,'হ্যাজার্ড সেন্টার'। ২০০৪-০৭-এর মধ্যে যে ৪৫ হাজার বস্তিঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় যার মধ্যে অন্তত সিকি ভাগ বাসিন্দা কোনো বিকল্প থাকার ব্যবস্থা পায়নি।

উচ্ছেদ হওয়া প্রত্যেক বস্তিবাসী যাতে পরিকাঠামোসহ উপযুক্ত পুনর্বাসন পায় তার জন্য গড়ে ওঠে বিভিন্ন বস্তিবাসী কমিটি, উদাহরণ:

চিত্র ১. বাওয়ানা বিস্থাপন এলাকার পরিত্যক্ত রাজীব রতন আবাস (২০০৮)
(Sushil Kumar/HindusthanTimes Photo)

'বাওয়ানা সংঘর্ষ সমিতি'। পুষ্‌তা কলোনির 'বিস্থাপন বিরোধী আন্দোলন' উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করে। রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি জানানো হয়। এমনকী প্রায় ৫০০ ছেলেমেয়ে তাদের পরীক্ষা পর্যন্ত অপসারণ পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন নিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে অবস্থান করে। কিন্তু পুরসভা বা *ডি.ডি.এ.*, উভয়েই পুনর্বাসনের দায় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে। অগ্রাহ্য হয় সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ১৯৮৫-র পর্যবেক্ষণ। বুলডোজার দিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় ৩০ বছরের পুরানো পুষ্‌তা কলোনি (গৌতম ভান ২০০৯, *এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড আর্বানাইজেশন,* ভল্যুম ২১/১)।

উচ্ছেদের পর বিভিন্ন বস্তির যেসব বাসিন্দা বিস্থাপিত হয়েছেন তাঁদের অনেকের পক্ষে কিন্তু নতুন এলাকাগুলি গ্রহণযোগ্য হয়নি (উদাহরণ: বাওয়ানা বিস্থাপন এলাকা)। এর কারণ প্রথমত, নতুন কলোনিগুলি পুরানো এলাকা থেকে এতটাই দূর (প্রায় ৩৫-৪০ কিলোমিটার) যে বস্তিবাসীদের কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক যোগাযোগগুলি হারিয়ে যায়। যার মাসে ৬ হাজার টাকা রোজগার তিনি কীভাবে ১০০০ টাকা রাহা খরচ করবেন। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন নতুন কলোনিতে বিস্থাপনের ফলে প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বস্তিবাসীদের যৌথজীবনের সংস্কৃতি নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত, নতুন কলোনিগুলিতে জল, পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার ইত্যাদি পুর পরিকাঠামো ও পরিষেবার সুবন্দোবস্ত না থাকায় সেখানে বসবাস অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে এবং বস্তিবাসীদের ফিরে আসার প্রবণতা দেখা যায়।

বিস্থাপনের জন্য প্রথমদিকে জমি দেওয়া হলেও পরে আরও জমি উদ্ধার ও বেশি ঘর সংকুলানের জন্য ফ্ল্যাটবাড়ি বানানোর পরিকল্পনা করা হয় (অবিকল সোমবংশী ৩০.১০.২০১৫, *ডাউন টু আর্থ*)। পরবর্তীকালে স্থানান্তরণের অসুবিধা ও জমির অভাবে বস্তিবাসীদের স্বস্থানে (*ইন সিটু*) রেখে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি.পি.পি.) মডেলে ফ্ল্যাটবাড়ি বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টা জোরদার হয় *মাস্টার প্ল্যান* ২০২১ প্রকাশ হওয়ার পর। এই মডেলে কোনো প্রাইভেট কোম্পানিকে ৬০% জমিতে বিস্থাপন এবং বাকি ৪০% জমি ব্যাবসার জন্য ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। নির্মাণ পর্বে বস্তিবাসীদের কয়েক বছরের জন্য কোনো অন্তর্বর্তী আস্তানায় (*ট্রানজিট ক্যাম্প*) পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

অন্তর্বর্তী আস্তানাগুলির হাল নতুন কলোনির থেকেও শোচনীয় হওয়ায় বস্তিবাসীরা বিরূপ হয়ে পড়েন। আবার ফ্ল্যাট বাড়িতে বসবাসে নতুন কলোনির উপরোক্ত অসুবিধাগুলি ছাড়াও স্থান সংকীর্ণতার সমস্যাও রয়েছে। বহুতল বাড়িতে ৫-৭ জনের পরিবার পিছু বরাদ্দ হয় মাত্র ২৫ বর্গ মিটার-এর একটি ফ্ল্যাট (রঞ্জিত সবিখি ০৩.০৭.২০১৭, *বিজনেস ওয়ার্ল্ড*)। ফলে যথাযথ কর্মপরিসর, যা বস্তিবাসীদের একান্ত চাহিদা, তার অবলুপ্তি ঘটে। একজন রিকশাচালক বা আনাজ বিক্রেতা কোথায় তুলবেন তাঁর রিকশা বা ঠেলাগাড়িটি, প্রশ্ন রাখেন *হ্যাজার্ড সেন্টার*-এর প্রতিনিধি। অন্যদিকে তৈরি ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রায় ২৬ হাজার ফ্ল্যাট বণ্টন পদ্ধতির জটিলতায় খালি পড়ে থাকে। (গুলাম জীলানি, ২৭.১১.২০১৭ ও ১৬.০২.২০১৮, *হিন্দুস্থান টাইম্‌স*)। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত '২০২২-এর মধ্যে সব শহরে সবার জন্য বাসা' প্রকল্পগুলির মাত্র ২% বস্তিবাসীদের '*ইন-সিটু*' পুনর্বাসনের জন্য অনুমোদন পায় (কুমার বিক্রম ৩০.১১.২০১৭, *দি নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*)।

(৮)

দিল্লিতে বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে এমন বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হত না যদি কেন্দ্র, রাজ্য ও পুরসভার মধ্যে উপযুক্ত বোঝাপড়া থাকত, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি বস্তিবাসীদের প্রতি সমানুভূতিসম্পন্ন হত, রাজ্য সরকার অপেক্ষাকৃত বাস্তবানুগ হত এবং পুরসভা তার ক্ষমতার যথাযথ সদ্‌ব্যবহার করতে পারত। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাক:

➢ বস্তি পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৬২-তে *ডি.এম.সি.*-তে খোলা হয় 'বস্তি ও ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি বিভাগ'। তারপর ১৯৯২ পর্যন্ত ডি.এম.সি. ও ডি.ডি.এ.-র মধ্যে বিভাগটি নিয়ে টানাটানি চলে এবং প্রশাসনিক বোঝাপড়ার অভাবে বিভাগটি বস্তি উন্নয়নে উপযুক্ত দায়িত্ব পালনে অক্ষম থাকে। অবশেষে ২০১০-এ প্রতিষ্ঠিত ডি.ইউ.এস.আই.বি পুরোপুরি বস্তি পরিকাঠামোর দায়িত্ব নেয়। আর ২০১২-তে দিল্লির পুর প্রশাসন পাঁচটি টুকরো হয়ে যায়; নর্থ দিল্লি, সাউথ দিল্লি ও ইস্ট দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট।

➢ ১৯৫৬-র 'স্লাম এরিয়া (ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স) অ্যাক্ট' অনুযায়ী বস্তি হল এমন বাসা যা বসবাসের অযোগ্য কিন্তু ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ির মতো দখলি জমিতে নেই। কিন্তু কেন্দ্রের পরিবেশ ও বন বিভাগ এবং দিল্লি সরকারের উন্নয়ন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২০০১-এ গৃহীত পরিবেশ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্যে এই সংজ্ঞার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। যেমন, দিল্লির যে ১৬৩৯টি অননুমোদিত বস্তির মাত্র ৮৯৫টি নিয়মভুক্ত হবে সিদ্ধান্ত হয় তার মধ্যে ৫৮৩টি বস্তি ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ির মতো সরকারি জমি দখল করেই আছে। হিসাবের এই জটিলতায় স্বভাবতই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয়ে পড়ে (*সিটিজ অফ দিল্লি, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ ২০১৫*)।

➢ কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে দু-কোটি বাড়ি তৈরি করে ২০২২-এর মধ্যে দেশের প্রতিটি নগর বস্তিমুক্ত করবে দাবি করলেও তার বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, এপ্রিল ২০১৯-এর মধ্যেই স্কিমের ২য় পর্যায়ের শেষে দেশের ৩০০টি নগর বস্তিমুক্ত হয়ে যাওয়ার কথা! যদিও আর্থিক উপদেষ্টা তথা অডিট

কোম্পানি কে.পি.এম.জি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই দাবি সফল করতে দেশে অন্তত ১১কোটি বাড়ি বানাতে হবে (*দি ইকনমিক টাইমস*, ১৮ জুন ২০১৫)। দিল্লির ক্ষেত্রে যাতে সর্বাধিক সংখ্যায় ন্যায্য বস্তিবাসীদের স্বস্থানে সহজে পুনর্বাসন দেওয়া যায় তার জন্য রাজ্য সরকার 'দিল্লি বস্তি ও ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি পুনর্বাসন ও বিস্থাপন নীতি ২০১৫' প্রণয়ন করে কিন্তু কেন্দ্রের অনুমোদন না পাওয়ায় তা কার্যকর হয়নি।

➢ কাঠপুতলি বিস্থাপনে বস্তিবাসীদের অসুবিধা প্রসঙ্গে ডি.ডি.এ-র প্রিন্সিপাল কমিশনার (আবাসন)-এর নৈর্ব্যক্তিক বক্তব্য 'সব পুনর্বাসিতের মতামত নেওয়ার কোনো আইনি বাধ্যতা নেই। . . . সব দাবিদারকে কখনোই সন্তুষ্ট করা যায় না'। দিল্লির বুকে ৭০কিলোমিটার রেলপথের ২২কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি। পুষ্‌তা কলোনির মতো এখানেও জনস্বার্থ মামলা হয় জাতীয় গ্রিন ট্রাইবুনালে।

চিত্র ২. বিস্থাপন কার্যক্রমে (এপ্রিল ২০১৩) ভেঙে দেওয়া আর.কে.পূরম ঝুগ্‌গি-ঝোপড়ি- (Photo: SHAHANA SHEIKH) Down to Earth 30.4.2014

আদেশ ছিল কেবল খালি করে দেওয়া ঝুগ্‌গি-ঝোপড়িগুলি ভেঙে দেওয়া যাবে। কিন্তু ২০০৬-১০-এ রেলপথের ধারে পুলমিঠাই বস্তির সব ঘরই ভেঙে দেওয়া হয়। যদিও মহারাষ্ট্রের আন্ধেরি রেলপথের ধারের বস্তিবাসীদের রেল কর্তৃপক্ষ পুনর্বাসন দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর দিল্লির ক্ষেত্রে ডি.ইউ.এস.আই.বি মাত্র ১১.২৫ কোটি টাকায় রফা করে যেখানে পুনর্বাসনের খরচ ১৪৭ কোটিরও বেশি (অবিকল সোমবংশী ৩০.১০.২০১৫, *ডাউন টু আর্থ*)। উল্লেখযোগ্য, এইসব জনস্বার্থ মামলা রুজু করেছিলেন দিল্লির শিক্ষিত সম্পন্ন অধিবাসীরাই।

➢ ২০১৫-তে রাজ্য সরকার দিল্লির বস্তিবাসীদের জন্য কিছু সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বাস্তবতার বিচারে দাক্ষিণ্য প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেয়ে যায়। যেমন:

১. প্রতি ৫০ জন পিছু জলের কল ও মাসে ২০ হাজার লিটার পর্যন্ত বিনামূল্যে জল সরবরাহ। অননুমোদিত বস্তিগুলিতে জলসত্র, যেখান থেকে ১০ পয়সায় এক লিটার জল মিলবে। স্বচ্ছতা রাখতে প্রতিটি জলের গাড়িতে জি.পি.এস. ট্র্যাকার। কিন্তু জলের উৎস নিশ্চিত না করে, আন্তঃরাজ্য জল সমস্যা না মিটিয়ে, যমুনাকে দূষণমুক্ত না করে, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক না করে কীভাবে এমন প্রতিশ্রুতি পালন হবে। কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ কীভাবেই-বা সম্ভব (*ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেট ওয়ার্ক*, ২০১৬)।

২. গণশৌচালয় ব্যবহার করতে আর পয়সা খরচ করতে হবে না। প্রতি ২৫ জন পিছু একটি পায়খানা ও ৫০ জন পিছু একটি স্নানাগার থাকবে। দিল্লিতে উন্মুক্ত মলত্যাগ বন্ধ করতে আরও ২৭ হাজার গণশৌচালয় স্থাপিত হবে। যদিও সুলভ সংস্থার হিসাবমতো গণশৌচালয় লাগবে আরও ৫০ হাজার (প্রজ্ঞা কৌশিক ০৮.০৭.২০১৫, *দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*)। তাছাড়া এগুলি পরিচ্ছন্ন ও চালু থাকা চাই। বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ না থাকলে গণশৌচালয়গুলি চালু রাখা যাবে কীভাবে।

৩. ১৬০টি দাতব্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে। ৬০০-র ওপর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জায়গার খোঁজ চলছে। আশা করা যায় ডাক্তার,

চিত্র ৩. জঞ্জাল কুড়ানি শিশুদের একটি দল
(asha-india.org/gallery/slum-condition)

স্বাস্থ্যকর্মীর বেতন ও বিনামূল্যে ওষুধের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে রাজ্য বাজেট বাড়বে।

৪. জঞ্জাল কুড়ানিদের সঠিকভাবে আবর্জনা বাছাই করে নবীকরণযোগ্য অংশ আলাদা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাদের আইডেন্টিটি দেওয়া হবে। এখন প্রশ্ন হল, যে বিপুল সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক এই কাজে যুক্ত কীভাবে তাদের স্বাস্থ্য নির্বিঘ্ন করে, শিক্ষা সুনিশ্চিত করে শৈশব-কৈশোর ফিরিয়ে দেওয়া যাবে, তার কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই।

৫. আদি বস্তিবাসী হিসাবে পুনর্বাসনের যোগ্যতার মান প্রসারিত হয়েছে, যেমন আয়ের সীমা বাড়িয়ে ১ লাখ করা হয়েছে, এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বসবাসের সময়ের মাপকাঠি, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক বস্তিবাসীকে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। কিন্তু যোগ্যতার মান বিচার রাজ্য সরকারের ওপর ছেড়ে দিলেও আইনি অধিকার ডি.ডি.এ-র হাতেই রয়েছে।

৬. সবশেষে পুনর্বাসিত বস্তিবাসীদের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিসরের অভাব প্রসঙ্গে জনৈক ডি.ইউ.এস.আই.বি আধিকারিকের বক্তব্য, যে ৪০% সম্পন্ন বাসিন্দা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে আসবেন, ৬০% ফ্ল্যাটে বসবাসকারী পুনর্বাসিত বস্তিবাসী তাঁদের কাছেই পরিচারিকা, রাঁধুনি, ড্রাইভার, দারোয়ান ইত্যাদি কাজ পেয়ে যাবেন, তাঁদের আর বাইরে কাজে যেতে হবে না (প্রজ্ঞা কৌশিক ০৮.০৭.২০১৫, *দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*)। যেন একদা বস্তিবাসী বলে তাঁদের আর স্বাধীন উন্নত পেশা নেওয়ার অধিকার নেই।

সবমিলিয়ে বস্তিবাসীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার স্বীকার করে

সবমিলিয়ে বস্তিবাসীদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার স্বীকার করে নিতে শাসক, প্রশাসক ও শিক্ষিত সম্পন্ন অধিবাসীদের প্রবল অনীহা রয়েছে।

নিতে শাসক, প্রশাসক ও শিক্ষিত সম্পন্ন অধিবাসীদের প্রবল অনীহা রয়েছে। নাগরিক সমাজ ও অর্থনীতিতে বস্তিবাসীদের যে কোনো অবদান আছে তা এঁরা মেনে নিতে পারেন না। এঁদের কাছে বস্তির অর্থ অপরিচ্ছন্নতা, অজ্ঞতা ও সৌন্দর্যহানি, যা নাগরিক স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও রুচির পক্ষে আপত্তিকর। এঁরা মনে করেন এর মূলে রয়েছে বস্তিবাসীদের দারিদ্র যার জন্য দায়ী তাঁরা নিজেরাই। নগরোন্নয়ন দূরস্থান, বস্তির উন্নতিবিধানেও বস্তিবাসীদের অভিমত বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয় না। অভিজিৎ ব্যানার্জী প্রমুখ (*ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার*, ২২.১০.২০১২) সমীক্ষায় দেখেছেন যেখানে বস্তিবাসীদের ৪৪% জলকে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখেন সেখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলররা তাঁদের বরাদ্দের প্রায় ৯০% রাস্তা বা অনুরূপ কম গুরুত্বহীন বিষয়ে ব্যয় করেন।

এবার এই প্রসঙ্গে দু-টি ভিন্ন ধারার অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণ:

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, ভারতবর্ষ (ওল্‌গা টেলিস বনাম বোম্বে মিউন্যাসি কর্পোরেশন মামলা ১৯৮৫-র রায় প্রদানকালে)-'জীবিকা নির্বাহের অধিকার জীবনের অধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। . . . (পথবাসীদের) উচ্ছেদ তাদের জীবিকা নির্বাহের অধিকার থেকে এবং পর্যায়ক্রমে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। . . . (দরিদ্র নগরবাসীরা) কোনো অবৈধ, অনৈতিক বা জনবিরোধী কার্যকলাপ চালাবে বলে পথে বা বস্তিতে বসবাসের অধিকার দাবি করেন না। তাঁদের অধিকাংশ তুচ্ছ হলেও মর্যাদাপূর্ণ পেশায় যুক্ত।'

আশা ইন্ডিয়ার পক্ষে ডা. কিরণ মার্টিন: 'যদি বিশ্বাস করি সব

ডি.ইউ.এস.আই.বি আধিকারিকের বক্তব্য, '৪০% সম্পন্ন বাসিন্দা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকতে আসবেন, ৬০% ফ্ল্যাটে বসবাসকারী পুনর্বাসিত বস্তিবাসী তাঁদের কাছেই পরিচারিকা, রাঁধুনি, ড্রাইভার, দারোয়ান ইত্যাদি কাজ পেয়ে যাবেন, তাঁদের আর বাইরে কাজে যেতে হবে না।' যেন একদা বস্তিবাসী বলে তাঁদের আর স্বাধীন উন্নত পেশা নেওয়ার অধিকার নেই।

মানুষেরই সমান মর্যাদায় বেঁচে থাকার অধিকার আছে তবে একসময় অবিচারের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। . . . আর তখন দান-দয়া-অনুগ্রহের সীমানা ছাড়িয়ে ন্যায়-বিচারের চৌহদ্দিতে এসে পা রাখতেই হবে, সামলাতে হবে সেই ব্যবস্থাকে যা মানুষকে গরিব করে এবং করেই রাখে। . . . যে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি প্রকৃতপক্ষে তার কোনো ক্ষমতাই নেই যদি না আমাদের বিশ্বাস তাকে সেই ক্ষমতা দিয়ে থাকে। কিন্তু আজ যদি আমাদের আস্থা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন বিশ্বাসবোধ, নতুন জীবনধারার প্রতি সমর্পিত হয় তাহলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষও ইতিহাস পরিবর্তনের নায়ক হয়ে উঠতে পারছে।'

নগরোন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ম. ইস্তিয়াক (*আই.টি.পি.আই. জা.* জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১০) যথার্থই বলেছেন, 'বস্তি উন্নয়নের নামে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছে, কিন্তু বস্তিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে সামান্যই। . . . তাই আজ বস্তিবাসীদের নগরের প্রথাগত কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করে নিতেই হবে।' প্রথাবদ্ধ রাজনীতিবিদ, প্রশাসক ও বিদ্বজ্জনেরা কি এবার একটু নতুন করে ভেবে দেখবেন? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক একজন সমাজ গবেষক, একটি নগরোন্নয়ন সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনাবিদ।

হোমিয়োপ্যাথি: একটি আলোচনা

ডা. অর্ক বৈরাগ্য

সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দী। রহস্যময় পৃথিবী—ম্যাজিক, মন্ত্রশক্তি, ডাকিনীবিদ্যা, কুসংস্কারে ব্যাপ্ত চরাচর। প্লেগ, কলেরা এমনকী সাধারণ কাটাছেঁড়া থেকে বিষিয়ে ওঠা ঘা-য়ে প্রাণ চলে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের। চিকিৎসা বলতে রক্ত বের করে ফেলে দেওয়ার মতো কিছু 'আসুরিক' ব্যাপার আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া। অজ্ঞান করার ওষুধ তখন স্বপ্নবিলাস। এই অমানুষিক চিকিৎসায় যত না প্রাণ বাঁচছে, যাচ্ছে তার অনেক বেশি । ভয়ে লোকে পারতপক্ষে হাসপাতালমুখো হয় না। এই অবস্থায় জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান প্রথাগত চিকিৎসার বাইরে সেই সময়ের নিরিখে বৈপ্লবিক ধারণা আনলেন যার প্রথম শর্তই ছিল অন্তত ক্ষতি না করা। এই চিকিৎসার মূল নীতি: ১. রোগের সমতুল্য লক্ষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ দিয়ে রোগের উপশম। ২. মূল রাসায়নিককে অত্যন্ত লঘু মাত্রায় শরীরে প্রবেশ করানো।

হোমিয়োপ্যাথি কি বিজ্ঞান?

১৭৮৯-এ WIlliam Cullen-এর লেখা বই অনুবাদের সময় হ্যানিম্যান লক্ষ করেন সিঙ্কোনা গাছের ছাল ম্যালেরিয়ার অনুরূপ লক্ষণ তৈরি করে, এই লেখা থেকে হ্যানিম্যান ভীষণভাবে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তিনি নিজের দেহে সিঙ্কোনা ছাল প্রয়োগ করে একই রকম রোগলক্ষণ পান। তিনি ধারণা করেন সম-লক্ষণ যুক্ত রাসায়নিক শরীরে প্রবেশ করালে তা রোগটি সারাতে সাহায্য করবে। এই নিয়ে প্রথম প্রবন্ধটি লিখলেন ১৭৯৬-এ আর প্রবন্ধগুচ্ছ বই হয়ে বেরোল ১৮১০ সালে (Organon of The Rational Art of Healing)। এখানে বাদ রয়ে গেল এই কথাটি যে, অনেক আলাদা আলাদা রোগ একই রকম লক্ষণ তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ, রোগের ডায়াগনোসিস না করে, কেন রোগ হচ্ছে তা না জেনে, শুধুমাত্র লক্ষণভিত্তিক (symptomatic) চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করা হল। ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্লাজ়মোডিয়াম তখনও আবিষ্কার হয়নি। অন্যদিকে, সিঙ্কোনা ছাল খেয়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসার কারণ এর মধ্যেকার অ্যালক্যালয়েডের উপস্থিতি, সেটা বোঝার মতো শরীরতত্ত্বের জ্ঞান তখনও আসেনি।

অ্যাভোগাড্রোর বিখ্যাত অণুতত্ত্ব (সম-মোলার যেকোনো পদার্থে অণুর সংখ্যা ধ্রুবক। পরে আবিষ্কার হল সংখ্যাটি ৬.০২২×১০২৩) এল ১৮১১-তে। অর্থাৎ হোমিয়োপ্যাথি আবিষ্কারের সময় পদার্থের অণুর ধারণাই আসেনি। কাজেই একটি রাসায়নিক শরীরে প্রবেশের পর শরীরে কী কী আণবিক পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কিত কোনো ধারণাই তাঁর ছিল না। সেই আদিম চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগে সে নিয়ে প্রশ্ন তোলারও অবকাশ ছিল না।

> হ্যাঁ, এবার আপনি বলতেই পারেন . . . বিজ্ঞান কি সব ব্যাখ্যা করতে পারে নাকি? বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতীত উপায়ে কাজ করে বললে সেটা শুধুমাত্র হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আর যুক্তি থাকে না। কারণ, সেক্ষেত্রে মাদুলি বা তাবিজও নিজেদের ব্যাখ্যাতীত বিজ্ঞান বলে দাবি করতে পারে।

হোমিয়োপ্যাথি রসায়নবিদ্যার ন্যূনতম বিয়োজনবাদেরও পুরোপুরি উলটো। হোমিয়োপ্যাথির নীতি অনুযায়ী দ্রবণে দ্রাবকের পরিমাণ বাড়ালে শক্তি বাড়তে থাকে। এখন সাধারণ অঙ্কের হিসেব বলে এক মোল পরিমাণ অণুর দ্রবণ (অর্থাৎ হোমিয়ো পরিভাষায় মাদার টিংচার) এক ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে নয় ভাগ দ্রাবক আবার উৎপন্ন দ্রবণের এক ভাগের সঙ্গে নয় ভাগ দ্রাবক এইভাবে এগিয়ে যেতে থাকলে ২৪ তম

বারের পর কোনো অণু থাকা অসম্ভব। যদি এই ডাইলিউশন এক এক পর্যায়ে ১০০ ভাগে করা হয় তাহলে ১২ বারের পর দ্রবণটি অণুহীন

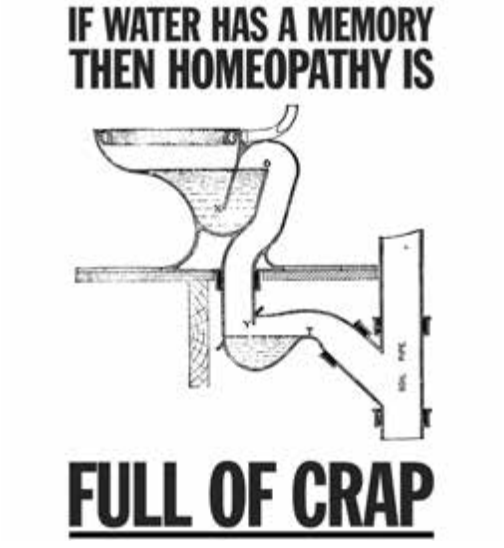

হয়ে যাবে। ১০০-কে হোমিয়ো হিসেবে C দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ ১২C-এর চেয়ে বেশি ডাইলিউট করা যে ওষুধ (?) হোমিয়ো ধারণায় উচ্চ-শক্তির, তাতে আসলে মূল রাসায়নিকের একটি অণুও থাকে না।

পরে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে কিন্তু কখনোই অণুহীন দ্রবণের কাজ ব্যাখ্যা করা যায়নি। ১৯৮৮-তে 'মলিকিউলার মেমোরি থিয়োরি অফ ওয়াটার' (Jacques Benveniste) বলে একটি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়, যেখানে বলা হয় মূল রাসায়নিকের একটি অণু না থাকলেও জলের অণুর স্মৃতিধারণ ক্ষমতার জন্য হোমিয়োপ্যাথিক ওষুধের কর্মক্ষমতা থেকে যায়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে জলের অণুগুলির মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন এত দ্রুত তৈরি হয় আর ভেঙে যায় যে স্মৃতি ধরে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। পরবর্তী কালে এ জাতীয় কোনো দাবি কখনোই প্রমাণ করা যায়নি। ঝাঁকুনি দিয়ে অণুর শক্তি বাড়ানোর দাবিও সম্পূর্ণ নাকচ হয়ে যায়।

তাহলে এত মানুষ যে ব্যবহার করছেন, তাঁরা কি সবাই বোকা?

পৃথিবী জুড়ে প্রচুর মানুষ দাবি করেন (পড়ুন বিশ্বাস করেন) ওঝার ঝাড়ফুঁক , গুণিনের মাদুলি, জ্যোতিষীর পাথরে উপকার হয়। চরণামৃত, পিরের কালো সুতো, জন্ডিসের মালা নিতে থিকথিকে ভিড় হয়। এটা বিশ্বাস। বিজ্ঞান নয়।

আর আধুনিক চিকিৎসা (মাথায় রাখুন, 'অ্যালোপ্যাথি' বলে আধুনিক চিকিৎসায় কোনো শব্দ নেই। এটিও হ্যানিম্যান সাহেবের বানানো) বলতে মূলত পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরবর্তী সময়কে বোঝায়। হোমিয়োবাদ ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। এই অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা অনেক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা থেকে সে অনেক গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞানের একটা বিষয় অন্য বিষয়ের থেকে মৌলিক প্রশ্নে বিপরীত অবস্থান নিতে পারে না, সেটা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা মেনে চলে। মেডিক্যাল ইনভেস্টিগেশন চিকিৎসার জগতে বিপ্লব এনেছে।

এখন সব মানুষের বিশ্বাস বদলানো অসম্ভব, বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, যেখানে অশিক্ষা ও কুসংস্কার এক চিরকালীন সমস্যা। জানিয়ে রাখি, সারা বিশ্বে একমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশেই হোমিয়োপ্যাথির এত রমরমা। বেশিরভাগ উন্নত দেশ তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি থেকে হোমিয়োপ্যাথিকে দূরে সরিয়ে রাখছে অথবা ব্যয়-সংকোচন করছে। কোনো হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ FDA ছাড়পত্র পায়নি। আর শুধুমাত্র ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচার্য বিষয় হলে তাবিজ-মাদুলিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মানতে হয়।

বহুদিনের রোগ হোমিয়ো দিয়ে ভালো সারে, অ্যালোপ্যাথি শুধু ইমার্জেন্সির জন্য

আপৎকালীন অবস্থায় শরীরের কলকবজা পালটে যায় না। ওষুধের কাজ করার পদ্ধতিও না। এটা প্রমাণিত যে হোমিয়োপ্যাথি যেহেতু মূলত মনস্তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে (placebo effect দিয়ে) কাজ করে, ইমার্জেন্সিতে এবং সত্যিকারের গুরুতর অসুখে হোমিয়োপ্যাথি কাজ করার প্রশ্নই ওঠে না। নিজে থেকেই কমে যাবে এমন রোগ ছাড়া হোমিয়োপ্যাথির কোনো ভূমিকা নেই।

কয়েকজন আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ডাক্তারও হোমিয়ো করেন শোনা যায় . . .

ব্যক্তিগত জীবনে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হলে তার দায় কি বিজ্ঞানের? বিজ্ঞানের ছাত্র যদি তাবিজ-মাদুলি পরে সেটা কি সত্যিই বিজ্ঞানের পরাজয়?

বরং আয়ুশের শাখাগুলি থেকে পাশ করা ডাক্তারের অ্যালোপ্যাথি প্র্যাকটিস (ইচ্ছে করেই বারবার আধুনিক চিকিৎসা কথাটা লিখছি না, যাতে বুঝতে সুবিধে হয়) করেন অর্থাৎ ক্রসপ্যাথি এক চিরকালীন সমস্যা।

তাহলে ভারত সরকার 'আয়ুশ'-কে মেনে নিলেন কেন?

যেকোনো দেশের নাগরিকের আদর্শ চাহিদা হল 'হেলথ ফর অল'। সবার জন্য বিনে পয়সায় আধুনিক চিকিৎসা। বিপুল জনসংখ্যা,

অপ্রতুল ডাক্তার, ক্রমহ্রাসমান স্বাস্থ্য-বাজেট . . . সব মিলিয়ে যখন কোনোভাবেই আদর্শের কাছাকাছি যাওয়া যাচ্ছে না, তখন অন্তত আয়ুশের মাধ্যমে জনগণকে 'কিছু তো একটা দেওয়া হচ্ছে' এমন বোঝানোর প্রচেষ্টা। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটি জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা।

অ্যালোপ্যাথি ওষুধের সাইড এফেক্ট বেশি. . .

আগেই দীর্ঘ আলোচনা করে দেখনো হয়েছে বেশিরভাগ হোমিয়ো ওষুধে মূল রাসায়নিক কিছুই থাকে না। দু-ফোঁটা জল অথবা অ্যালকোহল বা চিনির গ্লোবিউলসে তো সাইড এফেক্ট হওয়ার কথা নয়। এফেক্ট হলে তবে না সাইড এফেক্টের প্রশ্ন। আর হোমিয়ো ওষুধের মধ্যে স্টেরয়েড গুঁড়ো বা মডার্ন মেডিসিন ভরে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বহুবার। তার দায় কিছু অসাধু ব্যাবসাদারের, অবশ্যই হোমিয়োপ্যাথি সিস্টেমের নয়।

ডা. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

সাধারণ বিজ্ঞানসম্মত ধারণা বলে, বাইরে থেকে প্রবেশ করানো একটি রাসায়নিক ঠিক ডোজে দিলে কারও-না-কারও শরীরে কিছু-না-কিছু খারাপ প্রভাব (side effect) ফেলবেই। এই জায়গায় আসে কস্ট-বেনিফিট অ্যানালিসিস। অর্থাৎ পথ-দুর্ঘটনা বন্ধ করতে আমি পথটাকেই উপড়ে ফেলব কিনা . . .

তবু কাজ তো হয় . . .

শরীর একটি বহমান নদীর মতো। রোগের একটা বড়ো অংশ শরীর নিজেই সারায়। আঁচিল (নন-ক্যান্সারাস), সামান্য হাঁচিকাশি যেগুলো এমনিতেই সারবে হোমিয়ো তাতে মানসিক সান্ত্বনা দেয়। এই করতে গিয়ে কত কত ক্যান্সার বা অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছায় তা সংখ্যাতীত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মানসিক সান্ত্বনাদায়ী placebo চিকিৎসা তাহলে বাচ্চাদের জন্য ফলপ্রসূ হয় কীভাবে? উত্তরে জানাই: খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য জীবনযাত্রার পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তাছাড়া বাচ্চাটির মা-বাবা নিজেরাই ভাবতে শুরু করেন বোধহয় কাজ হচ্ছে, একে বলে indirect placebo effect.

আমি দেখিয়ে দিতে পারি কতজন উপকার পেয়েছেন . . .

কোনোকিছু বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে হলে উপযুক্ত স্টাডি করতে হয়। তার দ্বারা প্রমাণ করতে হয় যে রোগটি নির্দিষ্টভাবে এই ওষুধের জন্যেই উপশম হয়েছে এবং এই ওষুধ না দিলে রোগটি সারত না। নইলে তাবিজ এবং জ্যোতিষ-এর (সেখানেও সমস্যার সমাধান হয়েছে দাবি করা হয়) সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথির কোনো তফাত থাকে না। মূল মেকানিজম, ফার্মাকোকাইনেটিক্স, ফার্মাকো-ডাইনামিক্স, সাইড এফেক্ট, ইত্যাদি না জেনে কোনো রাসায়নিককে ওষুধ বলা যায় না।

বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করতে পারেনি হোমিয়ো আদৌ ওষুধ কিনা . . . কাজ করা না-করা এগুলো তার পরের কথা।

হ্যাঁ, এবার আপনি বলতেই পারেন . . . বিজ্ঞান কি সব ব্যাখ্যা করতে পারে নাকি? বিজ্ঞান ব্যাখ্যাতীত উপায়ে কাজ করে বললে সেটা শুধুমাত্র হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাতে আর যুক্তি থাকে না। কারণ, সেক্ষেত্রে মাদুলি বা তাবিজও নিজেদের ব্যাখ্যাতীত বিজ্ঞান বলে দাবি করতে পারে।

হ্যানিম্যান তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে যা ভেবেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক এবং অভাবনীয় কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মাথায় রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের ধর্মই নিজেকে পালটে নেওয়া। প্রতিনিয়ত নিজেকে নতুন নতুন রূপে প্রকাশ করা। হ্যানিম্যান নিজেই তাঁর বইয়ের পরিমার্জন করেন। পরিবর্তন-বিমুখ বর্তমান হোমিয়োপ্যাথি একপ্রকার ধর্মান্ধতা যেখানে হ্যানিম্যান ঈশ্বর, যাঁর সমালোচনা করা চলে না। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অর্ক বৈরাগ্য, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত।

মোদীকেয়ার: পুরোনো মদ নতুন নেশা

ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি মহাশয় কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষণা করলেন "আয়ুষ্মান ভারত" নামে একটি সুবিশাল স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প। এই ন্যাশনাল হেলথ প্রোটেকশন স্কিমের আওতায় আনা হবে দশ কোটি দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারকে। সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা হতে পারে আনুমানিক ৪০ থেকে ৫০ কোটি। পরিবার পিছু থাকবে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বিমার সংস্থান। সুবিধা মিলবে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের হাসপাতালেই। 'মোদীকেয়ার' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ এই স্বাস্থ্য প্রকল্প নাকি সারা বিশ্বে সর্ববৃহৎ। ভারতীয় প্রথামতো প্রকল্প চালু হবার আগেই তার অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের রাজনৈতিক গুণকীর্তন হয়তো পাঠকের চোখ এড়ায়নি। শুধু মুখড়া শুনলে মনে হতে পারে মোদীকেয়ার হয়তো সত্যিই স্বাস্থ্যে অচ্ছে দিন এনে ফেলল। কিন্তু আদতে কি তাই? নাকি আর পাঁচটা প্রকল্পের মতো এটিও ভোট আদায়ের একটি চটকদার ফিকির।

ভারতের মতো সুবিশাল দেশে যেকোনো জাতীয় প্রকল্প পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হবার দাবি রাখে। কিন্তু প্রশ্ন প্রকল্পের বৃহত্বে নয়। মহত্বে এবং কার্যকারিতায়। ভারতের জাতীয় স্তরে যেকোনো স্বাস্থ্য প্রকল্প যে বিশ্বের বৃহত্তম হওয়া প্রয়োজন সে নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। পৃথিবীর সমস্ত শিশু মৃত্যুর সিকি ভাগই ঘটে আমাদের দেশে। গর্ভাবস্থা বা প্রসবজনিত কারণে সর্বাধিক মাতৃমৃত্যুর দীর্ঘকালীন রেকর্ড আমাদের হাতে। সর্বাধিক যক্ষ্মা রোগী ও তদ্‌জনিত কারণে মৃত্যুতেও আমরাই এগিয়ে। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যা পিছু মাত্র ৮০ জন চিকিৎসক যে দেশে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা যেখানে একেবারে তলানিতে, সেখানে বৃহত্তম প্রকল্প তো লাগবেই। ভারতবর্ষে জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যবিমা এই প্রথম নয়। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০০৮ সালে চালু হওয়া রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা যোজনা বা সংক্ষেপে RSBY প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বসবাসকারী বা বিপিএল মানুষের জন্য পরিবার পিছু সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজার টাকার বাৎসরিক স্বাস্থ্যবিমার সংস্থান। তবে সেটা শুধু মাত্র হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন খরচ বাবদ। এর বাইরে সমস্ত খরচ পরিবারের নিজস্ব অর্থাৎ আউট-অফ-পকেট এক্সপেন্স। বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদের জন্য 'ই এস আই' নামক যে স্বাস্থ্যবিমা রয়েছে তা কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর। এই যৌথ-করদ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মালিক দুই পক্ষই বিমার প্রিমিয়াম দিতে থাকেন যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গ প্রাথমিক স্তর থেকে অন্তিম স্তর অবধি সব চিকিৎসা বিনা মূল্যে পান। তবে যে দেশে নব্বই শতাংশ মানুষ স্বনিযুক্ত পেশায় বা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন সেখানে 'ই এস আই' যথেষ্ট হতে পারে না। "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্পের ছাতার তলায় আরও বেশি মানুষ আসবেন এবং বেশি সুবিধা পাবেন বলে আশা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলতে হয় প্রয়োজনের তুলনায় তা বড়ো অপ্রতুল।

গড়পড়তা একজন ভারতীয়ের সারাজীবনে চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে থাকে হাসপাতাল বহির্ভূত খরচ। এমনকী হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীনও সব খরচ কখনোই মানুষ ফেরত পান না। খরচ করতে হয় নিজের পকেট থেকে। এই বিপুল ব্যয়ভার সরকারি, বেসরকারি কোনো বিমা প্রকল্পই গ্রহণ করতে নারাজ। মোদীকেয়ারও তার ব্যতিক্রম নয়। পাহাড়প্রমাণ চিকিৎসা-ব্যয় সামলাতে গিয়ে প্রতি বছর ছয় কোটিরও বেশি মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যান। নয়া প্রকল্পও সে সমস্যা সমাধানের কার্যকর দিশা দেখাতে অক্ষম। বিমার পরিসর শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তালিকাভুক্ত হাসপাতালে, সরকার নির্ধারিত দরেই তা লভ্য। সে দর কতখানি বাস্তবসম্মত তা নিয়ে থাকে বিস্তর প্রশ্ন। অতএব এই প্রকল্পও যে সাধারণ মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে এমনটা মনে করার সবিশেষ কারণ নেই।

নাম শুনে মনে হতে পারে এতদিনে হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার সবার জন্যে স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সে লক্ষ্য থেকে আমরা এখনও লক্ষ যোজন দূরে। জনমনে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে মোদীকেয়ার মারফত সুবিধা কারা পেতে চলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত "সোশিও-ইকোনমিক কাস্ট সেন্সাস"-এর ভিত্তিতে চিহ্নিত দরিদ্র ও অনগ্রসর পরিবারগুলিই এই বিমার আওতায় আসার কথা। গ্রাম-শহর, সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল সব ক্ষেত্রেই পাওয়া যাবে এই সুবিধা। বিমার ঊর্ধ্বসীমা পরিবার পিছু বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা। প্রকাশিত রোডম্যাপ অনুযায়ী চললে জুলাই ২০১৮ থেকে প্রকল্প চালু হয়ে যাওয়া উচিত। এই নয়া স্বাস্থ্যবিমার সমস্ত খরচ

কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন তা নয়। রাজ্য সরকারের কাঁধেও চল্লিশ শতাংশ ব্যয়ভার চাপানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি যারা নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমার বড়ি গেলানোর জন্য মরিয়া তারা কতখানি দরাজ হস্তে নতুন এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবেন তা অবশ্যই দেখার বিষয়। প্রায় এক বছর ধরে রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথি নামক একটি প্রকল্প চালু করার চেষ্টা চলছে। এখনও তা কার্যকরী হয়নি। মূল কারণ অবান্তর ও হাস্যকরভাবে সস্তার প্যাকেজ নির্মাণ।

মোদীকেয়ারের অনুপ্রেরণা নাকি ওবামাকেয়ারে নিহিত। বারাক ওবামার "অ্যাফর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট ২০১০" অবশ্য হাসপাতালে ভর্তি অবস্থার বাইরেও বেশ কিছু প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। যদিও মনে রাখতে হবে আমেরিকার কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার থাকলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর দেশটি প্রচুর উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। স্বাস্থ্যখাতে আমেরিকার চেয়ে অনেক কম খরচ করেও বেশ কিছু ইউরোপীয়ান দেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত স্বাস্থ্য সূচকে অনেক এগিয়ে। "সবার জন্য স্বাস্থ্য" বা "স্বাস্থ্য জনগণের অধিকার" ইত্যাদি আদর্শে বিশ্বাসী এই সব দেশে স্বাস্থ্য কোনো সরকার প্রদত্ত ভিক্ষা নয়। আমাদের শিক্ষা নিতে হবে ইউরোপের ওই সমস্ত দেশগুলি থেকে। এমনকী প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার কাছেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

"সবার জন্য স্বাস্থ্য" আর "সবার জন্য স্বাস্থ্যবিমা" এক নয়। বেসরকারি হাসপাতাল এবং বেসরকারি বিমা কোম্পানি দুয়েরই মূল লক্ষ্য মুনাফা। নামে 'পরিষেবা' হলেও আসলে স্বাস্থ্য তাদের কাছে পণ্যের বাইরে আর কিছু নয়। ক্রেতা সুরক্ষা আইনের আওতায় এসে সেই নীতি সরকারি মান্যতাও পেয়েছে। অতএব তাদের দিয়ে দেশের আপামর নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিষেবা বণ্টনের প্রচেষ্টা ভ্রান্ত সরকারি নীতিরই প্রতিফলন। সরকারি ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে স্বাস্থ্যবিমা ব্যাবসার এমনিতেই রমরমা। তার উপর RSBY মারফত যেখানে আগে ত্রিশ হাজারের বেশি দাবি করা যেত না সেই সীমা এখন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত। স্বাস্থ্যবিমার প্রসার ঘটালেই যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তা নয়। এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ আমেরিকা। তবে এর ফলে বিমা কোম্পানিগুলির যে পোয়াবারো হয় সেটা বোঝার জন্য তুখোড় অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। প্রশ্ন আসে আমাদের সরকার কি তাহলে আপামর জনগণের স্বাস্থ্যের চেয়েও বিমা কোম্পানিগুলির স্বার্থ রক্ষায় বেশি মনোযাগী? ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যবিমা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সম্মিলিত ব্যাবসা এখন ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বার্ষিক বৃদ্ধির হার কমবেশি ১৫ শতাংশ ছুঁইছুঁই। আর এই বাড়বাড়ন্তের পিছনে সরকারি প্রকল্পগুলির অবদানও অনস্বীকার্য। কোনো জনস্বাস্থ্য প্রকল্প তখনই টেকসই হয় যখন সেই প্রকল্পের আওতায় সকলকে আনা যায়। মোটামুটিভাবে সফল RSBY প্রকল্পের বিরুদ্ধে একটি বড়ো সমালোচনা অন্তর্ভুক্তিকরণের অভাব। করদাতারা শুধু কর গুনবেন আর এক শ্রেণির মানুষ তার সুবিধা ভোগ করবেন এই ধরনের একপেশে নীতি কালক্রমে অবহেলায়, দুর্নীতিতে অকাল মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়ে। পরিবর্তে সরকারি কোষাগার থেকে খরচ করে সবার জন্য বিনা খরচে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করলে করদাতাও উৎসাহ পান আর সরকারও তার পবিত্র কর্তব্য পালন করতে পারেন। স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলি এই মডেলেই চলে এবং ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্যসূচকে চোখ ধাঁধানো সাফল্য লাভ করে। এই ব্যবস্থা যে ভারতেও প্রয়োগ করা সম্ভব এবং তার ফলে যে সরকার দেউলিয়া হয়ে যাবেন না তার নিশানা আমরা পাই ২০১১ সালে পেশ হওয়া শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের রিপোর্ট থেকে। জিডিপির মাত্র তিন শতাংশ খরচ করে দশ বছরের মধ্যে যে বিনা খরচে সবার জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করা যায় তার হদিশ আমরা পেয়েছি অনেক দিন আগেই কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের এই কমিটির অনুমোদন আমরা কাজে লাগাই না। আমাদের স্বাস্থ্যখাতে খরচের বরাদ্দ জিডিপির এক শতাংশের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করেছে। ইতিমধ্যে সরকার বদলেছে কিন্তু জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের উদাসীনতার কোনো বদল হয়নি।

গ্রাম শহরে সরকারি হাসপাতালের শয্যার অভাব, সামগ্রিক পরিকাঠামোর অভাব, শিশুবিভাগে পর্যন্ত কুকুর বিড়ালের অবাধ বিচরণ অথচ আমরা রোবটিক সার্জারির স্বপ্ন দেখি। ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মশা মারতে আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অথচ একটি বৃহৎ সরকারি হাসপাতালে হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থাদি পরিপূর্ণ। প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ছেড়ে সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বদানের সমীকরণ এখনও বোধগম্য হল না। "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্পের আওতায় যাঁরা আসবেন তাঁদের অর্ধেকই আগে কোনো-না-কোনো সরকারি স্বাস্থ্যবিমার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁদের ভর্তিকালীন খরচ সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে এক লক্ষ টাকার মধ্যে। সরকারের সত্যিই যদি সদিচ্ছা থাকত তাহলে বহির্বিভাগের খরচও এই বিমার আওতায় আনা যেত। তা সত্ত্বেও প্রায় সবক্ষেত্রেই সামগ্রিক খরচ পাঁচ লক্ষের মধ্যেই থেকে যেত। ফলে গ্রামের গরিব মানুষজন আরও চিকিৎসামুখী হতেন। চিকিৎসা ব্যয়-জনিত কারণে তাঁরা দারিদ্রসীমার নীচে চলে যেতেন না।

বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তর। অনেকক্ষেত্রেই তা যুক্তিসংগত। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি ক্ষমতাও সীমিত। এমতাবস্থায় বেশি করে জনগণকে বেসরকারি হাসপাতালের দিকে ঠেলে দেওয়া তো তাদের মুনাফা লাভের নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া। আজকাল নেতা মন্ত্রীরা প্রায় কেউই নিজের চিকিৎসার প্রয়োজনে সরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন না। জনগণের জন্যে তাঁরা যে হাসপাতাল গড়ে রেখেছেন তা চাক্ষুষ করতে এত অনীহা কেন। সরকারি

হাসপাতালের হাল ফেরাতে পারলে তো আমাদের বেসরকারি হাসপাতালে যেতেই হত না।

ইতিহাসের পাতা নতুন করে লেখানোর ইচ্ছা প্রায় সব রাষ্ট্রনায়কেরই থাকে। চালু প্রকল্পের ইতরবিশেষ পরিবর্তন করে তার নাম বদলে দেওয়া অনেকদিনের পুরোনো খেলা।

নরেন্দ্র মোদীই-বা তার ব্যতিক্রম হতে যাবেন কেন। যোজনা কমিশন ভেঙে দিয়ে নীতি-আয়োগ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার পরিবর্তে জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—এসবই সেই মানসিকতার প্রমাণ। পূর্বতন সরকারের আমলে চালু হওয়া RSBY প্রকল্পের একটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ দেখা গিয়েছিল ২০১৬ সালে প্রকাশিত তৎকালীন কেন্দ্রীয় রাজস্ব সচিব স্বাক্ষরিত ইউনিভার্সাল অ্যাকসেস অ্যান্ড কোয়ালিটি শীর্ষক পুস্তিকায়। প্রায় দু-বছর পর এই পরিকল্পনা আরও প্রসারিত হয়ে "আয়ুষ্মান ভারত" প্রকল্পে পর্যবসিত হয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। পূর্বসূরি যেই হোক না কেন, মূল সমস্যা থেকে আমরা যে অনেক দূরে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির কথা ভুলে গিয়ে সেকেন্ডারি ও টার্শিয়ারি স্তরে আমরা তখনও মনোনিবেশ করেছি, এখনও করছি। প্রাইভেট হাসপাতালের বা বিমা সংস্থার পেট ভরলেও সমগ্র জাতির স্বাস্থ্যের সংস্থান এভাবে হয় না। ইলেকশন গিমিক সৃষ্টি করা গেলেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নৈরাজ্য থেকেই যায়। আর দেশের প্রতিটি মানুষ যতদিন না সন্তোষজনক পরিষেবা পাবেন সে নৈরাজ্য থেকেই যাবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখাটির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ *এই সময়* পত্রিকায় জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ।

Advt.

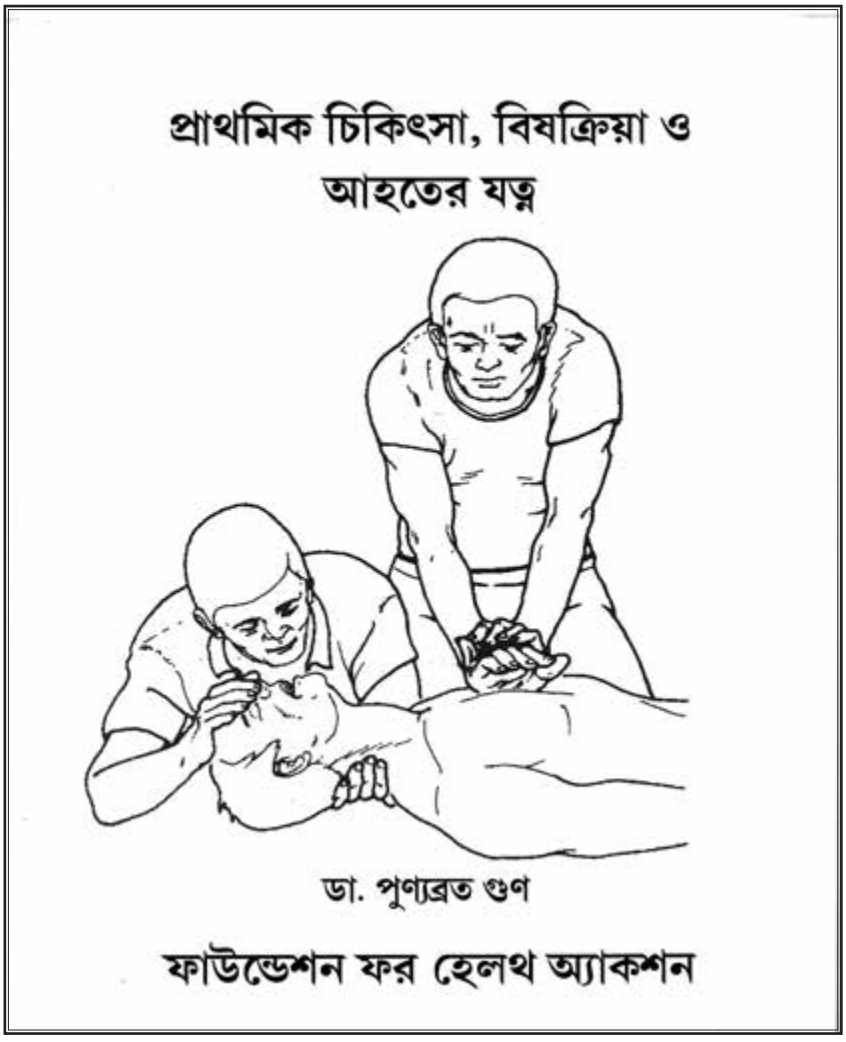

স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমস্যাটি ঠিক কোথায়?

উত্তর কি সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসেই?

ডা. বিষাণ বসু

গতমাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয় আমাদের ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল। মোটামুটি বিভিন্ন সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য একসঙ্গে সাজিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্যচিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস। হ্যাঁ, কিছু তথ্যগোপন-গোঁজামিল থাকবে মেনেও, দেশের স্বাস্থ্যের হালহকিকতের পরিচয় পাওয়ার নির্ভরযোগ্য সূত্র এটাই।

সাম্প্রতিকের তথ্য থেকে ভবিষ্যতের যে ছবিটি পাওয়া যায়, সেটি খুব উজ্জ্বল নয়। হ্যাঁ, শিশুমৃত্যু-প্রসূতিমৃত্যুর হার কমেছে, কমেছে জন্মহার, বেড়েছে গড় আয়ু। কিন্তু এগুলো তো যথেষ্ট নয়। অন্যান্য সব দেশের মতোই, এদেশেও রোগভোগের চিত্রটি বদলে যাচ্ছে। সংক্রামক ব্যাধিকে ছাপিয়ে অসংক্রামক ব্যাধি মূল সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এই অসংক্রামক ব্যাধিগুলি প্রায় সবক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক, আর চিকিৎসাও ব্যয়সাধ্য। এর পাশাপাশি, বেশ কিছু সংক্রামক ব্যাধিও ফিরে আসছে নতুন চেহারায়।

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, জিডিপির মাত্র ১.০২% সরকার ব্যয় করেন স্বাস্থ্যখাতে। প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায়ও কম। পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বিশ্বব্যাপী গড় ৬%। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার পরামর্শ, অন্তত ৫%। সেখানে মাত্র ১.০২%! সবচেয়ে হতাশাজনক তথ্য, বাজেটের এই বরাদ্দ, বিস্তর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও, শতাংশের হিসেবে, গত পাঁচ বছর অপরিবর্তিত। টাকার অঙ্কে নাগরিক-পিছু দৈনিক তিন টাকা। এই ছিটেফোঁটা দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা অসম্ভব।

পাশ্চাত্যের মূলধারার চিকিৎসাপদ্ধতিকে 'আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি' বা 'বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপদ্ধতি' বলাই সঙ্গত। হোমিয়োপ্যাথ-রা তাঁদের নিজস্ব চিকিৎসাপদ্ধতিকে 'হোমিয়োপ্যাথি' আর মূলধারার চিকিৎসাপদ্ধতিকে 'অ্যালোপ্যাথি' বলে অভিহিত করেছিলেন। আমাদের দেশে এই নামদুটো মানুষের কাছে খুব পরিচিত হয়ে গেছে, তাই এই নাম আমরা এখানে ব্যবহার করব—যদিও নামটি ঠিক নয়। দেশে রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের সংখ্যা সাড়ে দশ লক্ষের কাছাকাছি। কিন্তু, এঁদের মধ্যে ক-জন দেশের মানুষের নিয়মিত চিকিৎসা করেন, সেই তথ্য পাওয়া মুশকিল। মোটামুটি এর এগারো শতাংশ চিকিৎসক জড়িত আছেন সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে। সেই হিসেবে, জনসংখ্যার নিরিখে, প্রতি এগারো হাজার নাগরিকপিছু একজন সরকারি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার উপদেশানুসারে, থাকা উচিত, প্রতি হাজারে একজন।

আরও দুশ্চিন্তার কারণ হল, যে কথা নিয়ে রিপোর্টে আলোচনা হয়নি, নতুন পাশ করা ডাক্তারদের মধ্যে সরকারিক্ষেত্রে কাজ করার প্রবণতা কম। অন্যদিকে, রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সংখ্যাটা বছর বছর তেমনভাবে লাফিয়ে বাড়ছে না। আবার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ডাক্তারি পড়ার উৎসাহ কমছে। খবরে প্রকাশ, এইবছর ডাক্তারিতে ভরতি হওয়ার পরীক্ষায় কাটঅফ মার্কস কমিয়ে আনতে হয়েছে। সবমিলিয়ে, ছবিটা হতাশাব্যঞ্জক। রোগী-ডাক্তারের এই অনুপাত চটজলদি বাড়বে, এমন আশা কম।

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ চিকিৎসক যুক্ত আছেন বেসরকারি ক্ষেত্রে। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে, অনুমান করা কঠিন নয়, তাঁরা আছেন মূলত বড়ো-ছোটো শহরে। কাজেই, চিকিৎসকের সংখ্যাগরিষ্ঠই রয়েছেন, মূলত, শহরাঞ্চলে, যদিও জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছেন গ্রামাঞ্চলে। কাজেই গ্রামীণ স্বাস্থ্যের হাল পরিষ্কার। রিপোর্টে প্রকাশ, সব ক-টি স্বাস্থ্যসূচকেই গ্রামাঞ্চল শহরের থেকে অনেক পিছিয়ে।

কাজেই স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়বরাদ্দ-পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা নিয়ে আলোচনায় থেমে থাকলে চলবে না। কেননা, এ তো কোনো সমসত্ত্ব অপ্রতুলতার বিষয় নয়। সম্পন্ন ক্রেতা যথেষ্ট কড়ি ফেলতে রাজি থাকলে তাঁদের জন্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা হাজির এই শহরে। উচ্চবিত্তের জন্যে ডাক্তারের অভাব নেই। অন্যদিকে, একেবারে প্রান্তিক মানুষজনের চিকিৎসার জন্যে খুদকুঁড়োটুকুনিরও অমিল।

আসুন, এই অর্থাভাব বা বরাদ্দের অসম বিন্যাসকে সমস্যা হিসেবে না দেখে একটু অন্যভাবে বিচার করি। এমনও তো হতে পারে, এ এক গভীর অসুখের উপসর্গমাত্র? চলতি পথে না হেঁটে, চলুন, একটু স্বাস্থ্যরাজনীতির কথা বলি।

আগেই বলেছি, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডাক্তার হওয়ার উৎসাহ কমছে। নতুন পাশ করা ডাক্তারদের মধ্যেও অপেক্ষাকৃত ঝুঁকিহীন বিষয় বেছে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, কমছে সরকারি কাজের যোগদানের উৎসাহ। কাজের চাপ, সঙ্গে বিপুল মানসিক চাপ, তার সঙ্গে প্রতিপদে রাজনৈতিক দাদাগিরির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা, এমনকী শারীরিক লাঞ্ছনার ভয়—সবমিলিয়ে, কিছু সনাতন রোম্যান্টিক ভাবধারা বাদ দিলে, এই বাজারে ডাক্তারিকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত যুক্তি পাওয়া দুষ্কর।

সরকারি ডাক্তারবাবুদের কাজের চাপ চিরকালই অকল্পনীয়। ঘণ্টা-পাঁচেকের ওপিডিতে একার হাতে পাঁচ-ছশো রোগীর রোগ একমিনিটেরও কম সময়ে নির্ধারণ করে দাওয়াই বাতলানো, হ্যাঁ, স্যুটবুট-বিদেশি গাড়িহীন সেই আটপৌরে চিকিৎসকের দক্ষতা প্রায় অলৌকিক। এই কাজের বিনিময়ে তাঁর উপার্জন ঝাঁ-চকচকে সহকর্মীর ভগ্নাংশমাত্র। কিন্তু এতদিন তিনি এরই মধ্যে খুঁজে পেতেন তৃপ্তি, কেননা কাজের বাইরে অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিত্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে, স্বাস্থ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমলাদের দাদাগিরিতে, সরকারের কর্পোরেট আদর্শে

বেশির ভাগ মানুষই চিকিৎসকদের নিজেদের একজন হিসেবে ভাবতে পারছেন না। কিন্তু, কারণটা কী?

অনুপ্রাণিত দৈনন্দিন ফরমানে, তিনি ক্লান্ত, বীতশ্রদ্ধ। কাজের চাপ, সঙ্গে অকারণ মানসিক চাপ, সেইসঙ্গে হেনস্থার ভয়। সরকারি ডাক্তাররা চাকরি বাঁচাচ্ছেন হয়তো। কিন্তু, বুদ্ধিমান নবীন প্রজন্ম চাকরির পথ না মাড়িয়ে আগেই পিঠ বাঁচাচ্ছেন। জানি না, এই অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তবে কিছু অর্বাচীন আইএএস অফিসার খাড়া করে রোগী দেখার কাজটি খুব সম্ভবত চালানো সম্ভবপর হবে না। আর, পরিষেবা-ওষুধপত্র বিনেপয়সায় দিলেও, চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের প্রয়োজন বোধহয় অনস্বীকার্য।

বেসরকারি কর্পোরেটে যুক্ত থাকা ডাক্তারবাবুদের সমস্যা অন্যত্র। তাঁরা দিনের শেষে স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের বেতনভুক কর্মচারী। অনভিজ্ঞ আমলাদের দৌরাত্ম্য সইতে না হলেও, মার্কেটিং টিমের ক্রমাগত চাপ তাঁদের নিত্যসঙ্গী। ব্যাবসায়িক রিটার্ন দেওয়ার কথা দিনভর মনে রাখতে রাখতে, অনেকেই বিভিন্নভাবে আপোশ করে ফেলেন, নয়তো আত্মগ্লানির শিকার হন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তো জীবনের শেষ কথা নয়, তাই না? এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, পান থেকে চুন খসলেই মামলা-হয়রানির ভয়, রাজনৈতিক নেতাদের দাদাগিরি বা উকিলবাবুদের ব্ল্যাকমেইলিং-এর আতঙ্ক।

কাজেই ডাক্তারদের পক্ষে, প্রকৃত অর্থেই, এ বড়ো সুখের সময় নয়, এ বড়ো আনন্দের সময় নয়। এই দুর্দিনে চিকিৎসকের উপর হামলা হলে পুলিশ দোষীকে গ্রেফতার করে উঠতে পারে না, কিন্তু ডাক্তারের বিরুদ্ধে সামান্য অভিযোগে, পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে, গ্রেফতার করে। প্রশাসন ডাক্তারবাবুদের পাশে, এমন কথা খুব বড়ো সরকারপন্থী ডাক্তারও বোধহয় বলবেন না, অন্তত নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে বলবেন না।

কিন্তু এও অনস্বীকার্য, ডাক্তারদের এই লাগাতার অসম্মান-অপমান-হেনস্থায় সাধারণ মানুষ যে খুব বিচলিত, বা নিদেনপক্ষে ভাবিত, এমন প্রমাণ মেলে না। সাধারণ মানুষের চিকিৎসক ছাড়া চলে না। তথাপি এমনধারা নিরাসক্তির কারণ কী?

চিকিৎসকদের উপর লাগাতার আক্রমণ সত্ত্বেও, চিকিৎসকেরা এইটাকে মূলত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবেই দেখছেন। অথচ আমার মনে হয়, সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের পরিকাঠামো নড়বড়ে, সরকারি বরাদ্দ নামমাত্র, একশ্রেণির চিকিৎসকের ব্যক্তিগত দুর্নীতি, কর্পোরেট-লালসা, সরকারি অপদার্থতা ঢাকতে জনবিক্ষোভের অভিমুখটি ডাক্তারের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া—হ্যাঁ, এর প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিন্তু, এর সব মিলিয়েও চিকিৎসকদের প্রতি বেশির ভাগ মানুষের ভরসার অভাব বা বিদ্বেষের ব্যাখ্যা মেলে না।

এককথায়, বেশির ভাগ মানুষই চিকিৎসকদের নিজেদের একজন হিসেবে ভাবতে পারছেন না। কিন্তু, কারণটা কী?

সমাজের বেশির ভাগ মানুষকে দোষারোপ করার আগে, আসুন, একটু আত্মসমীক্ষা করা যাক।

সামাজিক আর্থিক অসাম্য আর স্বাস্থ্যক্ষেত্রে তার প্রভাব, স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর অসম বিন্যাস আর রোগীপরিজনের তজ্জনিত ক্ষোভ, স্বাস্থ্যরাজনীতির এইসব সাধারণ কথা নিয়েও বেশির ভাগ চিকিৎসকই তেমন ভাবিত নন। সবার জন্যে স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবিটি অধিকাংশ চিকিৎসক সংগঠনের এজেন্ডায় বিষয়টি স্থান পেলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ ডাক্তার তা নিয়ে প্রায় নীরব।

মোটের উপর, স্বাস্থ্যরাজনীতি নিয়ে কথা বলতে বা ভাবতে ডাক্তাররা অভ্যস্ত নন। এই নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এমনও শুনতে হয়েছে, এইসব নিয়ে ভাবাটা ডাক্তারদের কাজ নয়, ওগুলো ভাববেন পলিটিশিয়ানরা। অনেকেই বলেছেন আমাদের কাজ চিকিৎসা করা, অত সব ভাবতে বসলে চিকিৎসাটুকু হয় না।

কিন্তু, সত্যিই কি তাই? সমাজের মধ্যে থেকে, সমাজের মানুষের

চিকিৎসা করব আর যে সামাজিক ব্যাধি সেই চিকিৎসাকে পথভ্রষ্ট করছে, তাই নিয়ে ভাবব না, এ তো তাড়া খেয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে খরগোশের আত্মপ্রবঞ্চনার চাইতেও হাস্যকর ভাবনা!!!

প্রশ্ন জাগে, এই আত্মপ্রবঞ্চনা বা সমাজবিমুখ হওয়ার শুরু কোথায়? কেননা আমার স্থির বিশ্বাস, সমস্যার মূলে না পৌঁছোলে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান পাওয়া মুশকিল। স্বাস্থ্যরাজনীতি আর স্বাস্থ্যের সামাজিক ইতিহাসের নিবিড় পাঠ ভিন্ন, এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দুষ্কর।

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে, জার্মান চিকিৎসক, রুডলফ ভির্শ (Rudolf Virchow), স্বাস্থ্য আর রাজনীতির নিবিড় যোগাযোগের কথা বলেন। তাঁর কথায়, চিকিৎসাবিদ্যা সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত একটি বিষয় আর রাজনীতি এক বৃহৎ প্রায়োগিক অর্থে চিকিৎসাই। কেননা, ডাক্তার চিকিৎসা করেন ব্যক্তির, আর রাজনীতিক চিকিৎসা করেন সমাজব্যবস্থার। ভির্শ আরও বলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ হবে তখনই, যেদিন তা সমাজজীবন বা রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হতে পারবে', বা এইসব বিষয়ে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

নিয়তির পরিহাস, প্রায় একই সময়ে তাঁর ইউরোপীয় প্রতিবেশীরা এই উপমহাদেশে চিকিৎসাবিদ্যাকে রাজনৈতিক আধিপত্যের হাতিয়ার করে তুলছিলেন। ইংরেজ শাসনের আগে এদেশে চিকিৎসাব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না এমন তো নয়। কিন্তু, আমাদের ভাবনায় বা মননে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে সেই স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল উপনিবেশবাদী শক্তি, ঠিক যেমনভাবে পূর্বতন শিক্ষাব্যবস্থার উপরেও এসেছিল আক্রমণ। কাজেই, প্রচলিত সব চিকিৎসাপদ্ধতিকে ধ্বংস করে, শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথির রমরমার মধ্যে বিজ্ঞান যতখানি ছিল, রাজনীতি ছিল তার থেকে অনেকগুণ বেশি। আমাদের চিকিৎসাভাবনার জগতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির এই আধিপত্য এতটাই সুদূরপ্রসারী যে, শিক্ষাক্রমে উপনিবেশবাদের প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হতে থাকলেও, এই উপনিবেশোত্তর দুনিয়াতেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের মননে উপনিবেশের উপস্থিতি নিয়ে তেমন কথাবার্তা শোনা যায় না। আরেকদিকে, অন্যপথে হাঁটা সাহসী মানুষগুলিও রয়ে যান আলোচনার আড়ালে। যেমন, উপনিবেশবাদী চিকিৎসায় শিক্ষিত হয়েও, মেডিক্যাল কলেজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার, ঠিক কোনপথে, হ্যানিম্যানের ভাবনার সঙ্গে নিজের ধারণার সংশ্লেষণে, নতুন হোমিয়োপ্যাথির প্রয়োগ করলেন—দেশের বাস্তবতার সঙ্গে চিকিৎসাকে মেলানোর সেই প্রয়াস জানেন ক-জন?

এই উপনিবেশবাদী চিকিৎসাশিক্ষার প্রভাবে, আমাদের চিকিৎসা প্রায়শই এলিটিস্ট, আর চিকিৎসক রোগীকে দেখেন প্রায় অধস্তন হিসেবে (ঠিক যেমন, সরকারি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক অফিসের দারওয়ানকে প্রায় নিম্নবর্গের প্রাণীতুল্য তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে থাকেন)। এই উন্নাসিকতা রোগী-চিকিৎসকের ব্যবধানের অন্যতম কারণ বলেই আমার মনে হয়।

উপনিবেশবাদী শিক্ষার হ্যাংওভার হিসেবে, এদেশে শিক্ষা আর ক্ষমতা কোনো এক জায়গায় একাকার হয়ে যায়। শিক্ষার্জনের প্রভাব যেন শিক্ষিতকে ক্ষমতার অংশ করে তোলে। চিকিৎসা শিক্ষাও এর থেকে ভিন্ন নয়। দুর্ভাগ্য আমাদের, দেশের চিকিৎসা শিক্ষায় উপনিবেশবাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব আর জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় তার প্রভাব নিয়ে ইতিহাস-সমাজবিদ্যার অ্যাকাডেমিক বিতর্কটুকুও এদেশে বিরল।

অথচ, এই ধরনের আলোচনা ছিল অবশ্যপ্রয়োজনীয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রয়োজনের কথা না ভেবে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন হলে, কর্পোরেট হাসপাতালের জন্যে দক্ষ কর্মচারী পাওয়া যেতে পারে, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। হ্যাঁ, একটু অতিসরলীকরণ শোনালেও, ভেবে দেখুন, সমাজের উচ্চকোটির মানুষের স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানে এই পাঠক্রমসঞ্জাত ডাক্তারেরা খুবই উপযুক্ত, কিন্তু, দেশের বেশির ভাগ মানুষের অপুষ্টি-রক্তাল্পতা-সর্পাঘাত-সংক্রামক ব্যাধির মোকাবিলায় নব্যচিকিৎসকেরা, প্রায়শই, অপ্রস্তুত। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, ইংরেজ শিক্ষাক্রম তৈরি করেছিলেন উপনিবেশে কেরানির জোগান অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আবারও বলি, সেই ইংরেজদেরই চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যসূচি প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়ে অন্তত তাত্ত্বিক প্রশ্নটুকুও উঠে আসছে কি?

ভির্শ বলেছিলেন, স্থানীয় সামাজিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করে মানুষের অসুখের প্রকৃতি। আর পুষ্টির অভাব বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান অসুখবিসুখের অন্যতম প্রধান কারণ।

আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অবশ্য সামাজিক অসাম্যকে অসুখের কারণ হিসেবে ভাবতে শেখায় না। এমন শিক্ষায় রাষ্ট্রের অস্বস্তি। আজও, অপুষ্টি-ক্ষুধা-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ-দূষণ-ইত্যকার কারণ ছেড়ে, রোগের কারণ খোঁজা হয় বংশগতি-জিন ইত্যাদির মধ্যেই। ক্ষমতা এমন করেই ভাবতে শিখিয়েছে।

উপনিবেশবাদী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো চিকিৎসা পাঠক্রমে আরেকটি বাঁক এল গত শতকের শুরুতে। আমেরিকায় পেট্রোরাসায়নিকজাত ওষুধের বাজার খুঁজতে, কার্নেগী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও রকফেলারের অর্থানুকূল্যে আব্রাহাম ফ্লেক্সনার চিকিৎসাশিক্ষাকে ঢেলে সাজালেন। যেসব মেডিক্যাল কলেজ এই রিপোর্ট মেনে নিলেন, তাঁরা পেতে থাকলেন ঢালাও অর্থসাহায্য অনুদান। আধুনিক অ্যালোপ্যাথি বাদে, বাকি সব চিকিৎসাপদ্ধতি হল ব্রাত্য। এমনকী সেইসব চিকিৎসাপদ্ধতির চিকিৎসকদের অনেককে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হল। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন বাকি সব চিকিৎসাপদ্ধতির চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে

চাইলেন, আর বাকি পদ্ধতির চিকিৎসকদের অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে নেওয়া বন্ধ করলেন।

অন্যদিকে এই রিপোর্ট অনুসারে, চিকিৎসা গবেষণাকে বিজ্ঞানসম্মত করার নামে, চিকিৎসা গবেষণা আর চিকিৎসাকে বিচ্ছিন্ন করা হল। এর ফলে, চিকিৎসা গবেষকের সঙ্গে রোগীমানুষের এক অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হল। চিকিৎসাকে ছাপিয়ে গেল ল্যাবরেটরি মেডিসিন। গবেষণা হয়ে উঠল নৈর্ব্যক্তিক। সেই গবেষণার ফলও, অতএব, নৈর্ব্যক্তিক।

ফ্লেক্সনারের রিপোর্ট অনুসারী চিকিৎসা শিক্ষাই আজ সর্বত্র চালু। তথ্যে প্রকাশ, এই ধাঁচের শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পরেই ডাক্তারি একটি আর্থিকভাবে আকর্ষণীয় পেশা হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসকের পেশার প্রাথমিক গ্ল্যামারের চাইতেও, এই পথে বহুজাতিক কনগ্লোমারেটের বাণিজ্যিক সাফল্য এল। কয়েক দশক ভালোই চলছিল। কিন্তু, ফুলেফেঁপে ওঠা ব্যাবসার চূড়ান্ত সাফল্যের পথে এল নতুন সমস্যা। নয়া স্বাস্থ্যমডেলে চিকিৎসা বিক্রয়যোগ্য পরিষেবা, রোগী উপভোক্তা-ক্রেতা মাত্র। নৈর্ব্যক্তিক চিকিৎসায় স্বাস্থ্যব্যাবসার লাভ হতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থায় চিকিৎসক আর রোগীপরিজনের দূরত্ব অবশ্যম্ভাবী। নৈর্ব্যক্তিক চিকিৎসায় আর্থিক লাভ থাকে, ক্রেতার সন্তুষ্টি আসে না। মানুষ উপশমে চায় মানবিক মুখ, মানুষের স্পর্শ। কাজেই চিকিৎসা হোক নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু চিকিৎসক হোন মানবিক। কর্পোরেট লালসার ফ্রন্টডেস্কে থাকুন আন্তরিক চিকিৎসক। ক্রেতাও সন্তুষ্ট হোন, ব্যাবসাও জবরদস্ত। বিগ ফার্মা অর্থাৎ বৃহৎ ওষুধকোম্পানি, প্রমাণ-নির্ভর আধুনিক চিকিৎসার নামে ডাক্তারকেই চিকিৎসাক্ষেত্রে যে প্রান্তিক অবস্থানে নির্বাসিত করে ফেলছিল, সেই ভাবনাকে একটু থমকে দাঁড়াতে হল। অতএব একটু স্বাদবদল ।

"মানবিক" চিকিৎসক তৈরি করতে প্রচলন হল নতুন এক পাঠ্যবিষয়ের—মেডিক্যাল হিউম্যানিটিজ। না, এর মধ্যে চিকিৎসার সমাজতত্ত্ব নেই। অসুখের সামাজিক কারণ, অপুষ্টি-ক্ষুধার বিব্রত করার আলোচনা নেই। এর লক্ষ্য বিবেকবান চিকিৎসক তৈরি করা, যিনি রোগীর কষ্ট অনুভব করবেন, কিন্তু তাঁর পেছনে পচনশীল সমাজব্যবস্থার কথা ভাববেন না। সাপও মরল, লাঠিও রইল অক্ষত। মুনাফার লোভে বেপরোয়া কর্পোরেটের অংশ হয়েও, ক্ষমতাহীন মানবিক মুখের ডাক্তারকে দিয়ে কতদিন সচেতন গ্রাহককে বিভ্রান্ত করা যাবে, তার উত্তর একমাত্র সময়ই দিতে পারবে।

ভির্শ অবশ্য বলেছিলেন, চিকিৎসকেরা, হ্যাঁ, চিকিৎসকেরাই পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের পক্ষে সওয়াল করার সর্বোপযুক্ত পেশাদার। বলেছিলেন, আর এই সামাজিক সমস্যার নিরসনে সরব হওয়া চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম অঙ্গ।

কিন্তু, এমন করে ভাবলে ক্ষমতাসৌধের ভারী অস্বস্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা মানুষেরা শেখান, গরিবের কথা ভাবার মৌরসিপাট্টা তাঁদের। আর তাঁদের গরিবের কথা উচ্চারণের পেছনে লুকোনো থাকে বেসরকারি প্রভুর স্বার্থরক্ষার কর্মসূচি।

এদেশে যেমন, আপাতদর্শনে সম্পূর্ণ ভিন্নমত-ভিন্নমেরুর দুই দলের স্বাস্থ্যপরিকল্পনাও কোন এক মন্ত্রে এক জায়গায় মিলে যায়। ধীরে ধীরে নেতারা চিকিৎসার জন্যে বেছে নিতে থাকেন কর্পোরেট হাসপাতালকে। এমনকী শ্রেষ্ঠ সরকারি হাসপাতালেও মন্ত্রীর চিকিৎসা করেন কর্পোরেট ডাক্তার। ফিতে কাটা বা অব্যবস্থা-অনুসন্ধানের ঝটিকাসফর ছাড়া প্রভুদের পা পড়ে না সরকারি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে। স্বভাবতই, সরকারি হাসপাতালের বিশ্বাসযোগ্যতা ঠেকে তলানিতে। কর্পোরেট হাসপাতালের শেয়ারের দাম পৌঁছোয় আকাশে।

কেন্দ্রের সরকার সরাসরি চিকিৎসাখাতে বরাদ্দ কমিয়ে সবার জন্যে স্বাস্থ্যবিমা চালু করেন। লাভের গুড় পৌঁছায় বেসরকারি বিমাসংস্থা আর স্বাস্থ্যব্যবসায়ীর খাতায়। আর, রাজ্যের সরকার চিকিৎসা-অব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের নামে নয়া আইন তৈরি করেন। ছোটো নার্সিংহোম উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়ে মফস্বল শহরেও কর্পোরেট প্রসারের দুয়ারটি খুলে দেওয়া হয়। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা বেসরকারি ব্যবসায়ীদের জন্যে হয় উন্মুক্ত। পাবলিক-প্রাইভেট যুগলবন্দি। বাড়তি সম্মানে কর্পোরেট ডাক্তারবাবুরা সরকারি হাসপাতালে রোগী দেখার সুযোগ পান। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটিতে বাড়তি গুরুত্ব পান বেসরকারি ডাক্তারেরা। স্বাস্থ্যবিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন আমলাদের অপরিণামদর্শী ফরমানে ক্রমশই ধ্বংস হতে থাকে গরিবের একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

অনেক অকারণ শোরগোলের মাঝে, আস্তে আস্তে, সবার জন্যে স্বাস্থ্যের সরব দাবি মৃদু গুঞ্জন হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

আমরা চিকিৎসকেরা, এতখানিই ইতিহাস-অচেতন, এতটাই সমাজ-অন্যমনস্ক হয়ে থাকি, যে নিজেদের সমাজবিচ্ছিন্নতা বুঝতেও পারি না, তার স্বরূপ অনুধাবন তো অনেক পরের কথা।

আজ আসুন, একটু নতুন করে ভাবি। ভির্শ-র কথা মাথায় রেখে সামাজিক অসাম্য বিষয়ে সোচ্চার হই। জোর গলায় দাবি করি, দেশের প্রয়োজন মেনে একটি স্বাস্থ্যমডেলের। সবার জন্যে স্বাস্থ্যের সমানাধিকার চেয়ে পথে নামি।

ক্রিকেট বিষয়ে একটি বহুলপ্রচলিত উদ্ধৃতিকে একটু ঘুরিয়ে বলি, তাঁরা কী চিকিৎসা বোঝেন, যাঁরা শুধু চিকিৎসাটুকুই জানেন !!

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক।

হোস্টেলে সুস্থ জীবনের দাবি: জয়ী মেডিক্যাল

স্বাস্থ্যের বৃত্তে, ২৩ জুলাই, ২০১৮, মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের অভাব বহুদিনের। একটি ১১ তলা বাড়ি বহুদিন ধরে তৈরি হচ্ছিল, সম্প্রতি তার কাজ শেষ হয়েছে। সেটিতে ছেলেদের হোস্টেল করা হবে, এমন ঘোষণার পরেই মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ জানান, তাতে কেবল নতুন প্রথম বর্ষের ছাত্রদেরই রাখা হবে। প্রথম বর্ষের ক্লাস এখনও শুরু হয়নি।

এতে যেসব ছাত্ররা দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষেও হোস্টেল পায়নি, দূর থেকে এসে ক্লাস করছিল, সকাল-সন্ধ্যে ওয়ার্ডে রোগী দেখছিল, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষের কাছে ধরনা দেয়। অধ্যক্ষ তাদের কথাকে উড়িয়ে দেন, ও শেষে পুলিশ দিয়ে লাঠিচার্জ করে তাদের হঠিয়ে দেন।

ন্যায়বিচারের অন্য পথ না পেয়ে ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালীন অনশনের পথ নেয়। ছ-জন ছাত্র ১০ জুলাই থেকে অনশনে বসে। সেই অনশনে ছেলেদের চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, ব্লাডপ্রেসার সুগার বিপদসীমার নীচে, ইউরিনে কিটোন বডি জানান দিল দেহের অপূরণীয় ভাঙন। তারপর ডাক্তাররা নামলেন, জুনিয়র ডাক্তাররা কাজ বন্ধ করলেন, সিনিয়র ডাক্তাররা এলেন অনশনক্লিষ্টদের পাশে। অন্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আর নাগরিক সমাজ নামলেন প্রথমে সোশ্যাল মিডিয়ায়, তারপর পথে। ২২ জুলাই মেডিক্যাল কলেজে গণকনভেনশনে হল উপচে পড়ল। সব শেষে ২৩ জুলাই সরকার ছাত্রদের দাবি মেনে স্বচ্ছ, সবার সামনে করা কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে সব হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীদের সিট বণ্টনের কথায় সায় দিলেন। এটা অতি সাধারণ ন্যায়বিচারের ব্যাপার, এর জন্য ছাত্রদের ১৪ দিন অনশন করতে হল কেন বোঝা দায়।

মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার তৈরি হয়। সেই ডাক্তারদের নিজেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন? কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল ছাড়া অন্য কিছু বলার পরিসর এখানে নেই। ২০১১ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ২৫০ করা হল। হোস্টেল বাড়ল না। গার্লস হোস্টেলে যে ঘরে তিনজন থাকতেন সেখানে ৯ জনকে গুঁজে দেওয়া হল। ছেলেদের হোস্টেলে ঘরে গুঁতোগুঁতি করে ঢোকানোর পর একটি হোস্টেলে ছাদের ওপর একটি তলা তোলা হল, যার ছাদ প্রায়ই ছাত্রদের ওপর ভেঙে পড়ে। হোস্টেলগুলো আবর্জনাস্তূপে ভর্তি, দেখভাল নেই। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দূর থেকে যাতায়াত করে, পেয়িং গেস্ট হিসেবে, অনেকের পক্ষে সাধ্যাতীত খরচ করে, পড়াশুনো করে। তবু ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাদের একটা সান্ত্বনা ছিল যে হোস্টেল-সিটের অভাবটুকু নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। বাড়ি থেকে কলেজের দূরত্ব আর সিনিয়রিটি অনুযায়ী হোস্টেল সিট বণ্টন হত, 'ওপেন কাউন্সেলিং' করে। সেটা গত তিনবছর তুলে দেওয়া হল।

এই পরিস্থিতিতে নতুন ১১ তলা হোস্টেল তাদের বিরাট আশা দিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কর্তৃপক্ষ জানালেন, ওখানে কেবল প্রথমবর্ষের ছাত্ররা থাকবে, যাদের ক্লাস তখনও শুরু হয়নি। চিকিৎসা ব্যাপারে ভারতের নিয়ামক সংস্থা 'মেডিক্যাল কাউন্সিল' নাকি প্রথমবর্ষের ছাত্রদের র‍্যাগিং আটকাতে আলাদা হোস্টেলে রাখার ফরমান দিয়েছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ১৮৪ বছরের ইতিহাসে র‍্যাগিং বলে জিনিসটি হয়নি।

মেডিক্যাল কাউন্সিল বলেছে, প্রথমবর্ষের ছাত্রদের আলাদা রাখতে, আলাদা হোস্টেল, না হলে আলাদা ব্লক, এবং কর্তৃপক্ষর নজরদারি। সেটাকে ঢাল করে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুরো হোস্টেলটা কেন প্রথমবর্ষের ছেলেদের বাড়ি থেকে ডেকে দ্রুত ঢুকিয়ে দিতে চাইছেন তা বোঝা গেল না। আর মেডিক্যাল কাউন্সিল আরও বলেছে, ডাক্তারি পড়ুয়াদের শতকরা ৭৫ জনকে হোস্টেল দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা করে নতুন হোস্টেল প্রথমবর্ষের ছাত্রদের দিলে আপত্তি কিছু ছিল না।

ছাত্ররা চেয়েছে, স্বচ্ছ হোস্টেল কাউন্সেলিং চালু হোক। প্রথমবর্ষের ছাত্রদের হোস্টেলের আলাদা ব্লকে রাখা হোক। কিন্তু প্রথমবর্ষের ছাত্রদের আলাদা রাখার নাম করে সিনিয়র ছাত্রদের ক্লাস করা, ওয়ার্ডে রোগী দেখা শেখা, এসব সম্পূর্ণ অবহেলা করা হল।

শেষপর্যন্ত ছাত্রদের ন্যায়বিচার পাবার প্রবল আবেগ জয়ী হয়েছে। শাসকদের রাজনীতির বোড়ে হতে তারা অস্বীকার করেছে। আশা রাখা যায় ভবিষ্যতে এই চিকিৎসকরা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্যও এইরকম প্রাণপাত করবেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে